বিবিধ প্রবন্ধ

শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা, বিদ্যাবিনোদ

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা-২৯ ॥ কলিকাতা-৯

'শ্রীধর প্রকাশনী'র পক্ষে শ্রীপরেশবিজয় সাহানা-র
নিয়োগক্রমে প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

প্রকাশক : শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা ॥ ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯
ও ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস ॥ ১২১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

বিবিধ প্রবন্ধ

সূচীপত্র

ভূমিকা

'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের সব কয়টি প্রবন্ধই বাঁকুড়ার অধুনালুপ্ত 'শঙ্খ' ও 'হিন্দুবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইলেও এই প্রবন্ধগুলির মূল্য নিতান্ত সাময়িক নহে—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই এইগুলি সঙ্কলিত করিয়া পাঠকদের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

সুপরিচিত সাহিত্যিক শ্রীমণি বাগচি এই গ্রন্থখানির সঙ্কলন ও সম্পাদনা কার্য্যে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। তিনি আমার পরম স্নেহাস্পদ, তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া তাঁহাকে আমার আন্তরিক প্রীতি জানাই। ইতি—

আনন্দকুটীর
বাঁকুড়া
১৩৬৬

শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা

বিবিধ প্রবন্ধ

রাজনীতিক হইবার সাধ

আমাদের যৌবন প্রভাতে কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলাম। অভিধানের সাহায্য লইয়া তাহার নাম দিয়াছিলাম 'কিশোর সঙ্ঘ'। সত্যের অনুরোধে একটা কথা গোপন করিতে পারিতেছি না। আমাদের দেওয়া ঐ আদরের নাম আমাদের কয়জনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; অন্যে বলিত ডেঁপো-চ্যাংড়াদের আড্ডা; সে আড্ডায় মানব-জ্ঞানের বিষয়ীভূত সব বিষয়েরই আলোচনা হইত। যদিও অনেক সময়ে বিষয়গুলির নামও শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হইত না তবুও খুব জোর আলোচনা হইত। বাসরঘরে ব্রহ্ম-সঙ্গীত এবং প্রজ্জ্বলিত শ্মশানে নিধুবাবুর টপ্পা যে অবশ্য গেয় তাহাও আমরা জোর গলায় ব্যক্ত করিতাম। একদিন আমাদের সঙ্ঘের একজন সভ্যের মাতুল মহাশয় তাহাদের গৃহে আসিলেন। মাতুল ছিলেন সুপণ্ডিত জ্ঞানী, কোন এক কলেজের অধ্যাপক। তিনি যখন আমাদের ভ্রাতৃস্থানীয় একজন সভ্যের মাতুল তখন আমাদের সকলের মাতুল না হইয়া তাঁহার ত পরিত্রাণ ছিল না। সঙ্ঘের সভ্যগণ আমরা

তাঁহার কাছে গিয়া অতিভক্তিভরে প্রণাম করিলাম। অতি-ভক্তির সহিত যে জীবের নিত্য সম্বন্ধ মামা আমাদের মধ্যে সে জীবের কোন লক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না। তবে তিনি আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সেদিনের গুরুবিষয়ে গভীর আলোচনার নিয়ামক সভাপতি হইতে স্বীকৃত হইলেন। সভা আরম্ভ হইল; কিশোর সঙ্ঘের সভ্যগণের অনেকেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ, জাতিভেদ, বাল্য-বিবাহ, বর-পণ প্রভৃতি বহু বিষয়েই আলোচনা করিলেন। মামার চোখে মুখে একটা বিহ্বলতার ভাব; জল ছাড়া মাছের অবস্থার ভাব সকলেই লক্ষ্য করিলাম। সভা ভঙ্গ হইলে আমরা আগ্রহ ভরে মামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মামাবাবু, আলোচনা কেমন হইল?" মামা গোঁফের গোড়ায় একটু হাসিয়া বলিলেন, "বাবা সকল, তোমাদের সভায় আলো ত বড় একটা দেখিলাম না তবে চনা (গোমূত্র) খুবই দেখিলাম।" রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আমার আলোচনা ঐ কিশোর সঙ্ঘের আলোচনা অপেক্ষা উচ্চস্তরের হইবার আশা দেখি না বলিয়া টানাছেঁড়া শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছিলাম। আমার আলোচনায় পাঠকগণ আলো না দেখিয়া দেখিবেন অন্ধকার আর চনা বা গোমূত্রের তীব্র গন্ধ ভোগ করিবেন বলিয়াই আশঙ্কা করি।

আমার রাজনীতি চর্চ্চার ইতিহাস বলি। প্রথম যৌবনে যখন দেখিলাম সংবাদপত্রগুলির সর্ব্বাঙ্গ রাজনীতিকদের

কথাতেই তাঁহাদের নিন্দা বা প্রশংসায় পূর্ণ তখন ভাবিলাম রাজনীতিকের আসনই দুঃখক্লিষ্ট মানবের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। তখন বিচিত্র মানব ব্যাপারের জ্ঞান কিছুমাত্র হয় নাই, অথচ প্রথম যৌবনের উৎসাহ, উদ্যম—সত্য বলিতে হইলে বলিতে হয় চাঞ্চল্য বান ডাকিয়া চলিয়াছিল। আমাদের ছাত্রাবাসে থাকিতেন কৃষ্ণরাম রায়। তিনি ছিলেন সুবিবেচক ও স্নেহশীল। তাহার উপর ছিলেন এম-এ ক্লাশের দর্শনের ছাত্র। তিনি ছিলেন সর্ব্ববিষয়ে আমার উপদেষ্টা, গুরু ও স্নেহশীল কৃষ্ণদা। একদিন তাঁহাকে বলিলাম, "কৃষ্ণদা, আমি রাজনীতিক হইতে চাই; কি করিলে রাজনীতিক হইতে পারি সে বিষয়ে উপদেশ দিন।" কৃষ্ণদা কৃপার হাসি হাসিয়া, ছোট ভাই-এর অন্যায় আব্দারে বড় ভাই মাথায় হাত বুলাইয়া যেভাবে তাহাকে শান্ত করে সেইভাবে আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ও খেয়াল কি জন্যে হোল? ও পাগলামি ছাড়। তোমার বাপ মা তোমার পড়াশুনার জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া তোমার কলিকাতা বাসের খরচ যোগাইতেছেন; তোমার প্রধান কর্ত্তব্য বিদ্যালাভ ও জ্ঞানার্জ্জন করা। তাহা না করিয়া তুমি যদি হৈ চৈ-এ মাতিয়া সময় নষ্ট কর তোমার কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটিবে। আর তোমার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় আমি ত ভাল করিয়াই জানি, তাহাতে এখন তোমার রাজনীতিক হইবার কোন আশা নাই।" কৃষ্ণদার কথাগুলো আমার মনে সূচের মত বিঁধিল।

আমি অনুরাগের সুরে বলিলাম, "কৃষ্ণদা, আপনি এ কি কথা বলিতেছেন ? আমার জানা কতজন পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে স্কুল ছাড়িয়া রাজনীতিক হইয়াছে ; তাহাদের গুণগানে সংবাদপত্রের অঙ্গ ভরিয়া যায় ; কাগজে তাহাদের ছবিও বাহির হয়। আরও দেখি পল্লীগ্রামের নিরক্ষর অকেজো কত তরুণ জোর গলায় বুলি আওড়াইয়া পল্লীপথ মুখর করিয়া তোলে। তাহারা যদি রাজনীতিক হইতে পারে আমি কেন পারিব না ? আমি দুই-দুইটা পাশ করিয়া কলেজে পড়িতেছি, অথচ আপনি কেন বলিতেছেন আমি রাজনীতিক হইতে পারিব না ?" কৃষ্ণদা কৃপার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি হৈ চৈ-এ মত্ত বুলি-আওড়ান রাজনীতিক হইতে চাও, তাহা হইতে পার। তবে জেনো তাহারা রাজনীতির মহারথী ত নয়ই, রথী অর্দ্ধরথীও নয় ; তাহারা রাজনীতির ডন্ কুইক্সোট ; সত্য বলিতে হইলে বলিতে হয় তাহারা রাজনীতি বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের ভাটভিখারী। বাঁচিয়া থাকা ব্যাপারেও যাহা, রাজনীতি ব্যাপারেও তাহাই। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

তরবোঽপি হি জীবন্তি, জীবন্তি মৃগপক্ষিনঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি ॥

ঐ গাছপালা বা পশুপক্ষীগণও বাঁচিয়া থাকে, তবে সে বাঁচা ত আর সত্যিকারের বাঁচা নয় ; মানুষের মধ্যেও যে কয়জন মননের দ্বারা জ্ঞানার্জ্জন করিয়া বাঁচিয়া থাকেন

তাঁহাদের বাঁচাই যথার্থ বাঁচা। রাজনীতিতেও যাঁহারা বহু চিন্তার দ্বারা মনকে বহু জ্ঞানের ও বহু প্রীতির ভাণ্ডার করিয়া তুলিয়াছেন, যাহারা দেশ ও দেশবাসীর প্রকৃত অবস্থা সম্যক-ভাবে অবগত হইয়া মানব মঙ্গলের জন্য চিন্তা ও কার্য্য করেন তাহারাই যথার্থ রাজনীতিক। কংগ্রেসের প্রথম অবস্থায় কংগ্রেসের দিকপাল মহারথীগণের সম্বন্ধে বিদ্যা ও জ্ঞানের বিশাল হিমাচল ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কি বলিয়াছিলেন শুনিয়াছ কি?" বলিলাম, "না; বলুন তিনি কি বলিয়াছিলেন?" "আজ এখন বাহিরে যাইতেছি, অন্য দিন বলিব"—এই বলিয়া কৃষ্ণদা বাহির হইয়া যাইলেন।

কৃষ্ণদার অবসর রহিয়াছে দেখিয়া বলিলাম, "দাদা, সেদিন যে ডাক্তার শীলের কথা বলিবেন বলিয়াছিলেন এখন ত অবসর রহিয়াছে, বলুন শুনি।" কৃষ্ণদা বলিলেন, "হাঁ ভাই, বলিতেছি, শোন। সামান্য ছুতা ধরিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মহাতেজস্বী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী আই. সি. এস.-কে এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে বিতাড়িত করিল। মনে হয় ভারতের মঙ্গলের জন্যই শ্রীভগবানের অঙ্গুলি চালনাতেই ব্রিটিশের স্কন্ধে দুষ্টা সরস্বতীর আবির্ভাব হইয়াছিল। শৌর্য্য-সম্পন্ন সুরেন্দ্রনাথ দমিলেন না, বিপুল উৎসাহের সহিত তিনি ভারতীয় জনগণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের দ্বারা সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি হইলেন নব্য ভারতে

জাতীয়তাবাদের জনক। তাঁহার চিন্তা ও অপূর্ব্ব বাগ্মিতাতেই সারা ভারত জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হইল। তাঁহার ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণের প্রচেষ্টায় ১৮৮৫ সালে বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইল। প্রথম প্রথম ভারত-বাসীদের মধ্যে কংগ্রেস লইয়া খুবই আলোচনা হইত। মানুষের রুচির বিচিত্রতার জন্য অনেকে কংগ্রেসের সমর্থক থাকিলেও অনেকে কংগ্রেসের বিরোধী ছিলেন। কাজেই কংগ্রেস সম্বন্ধে আলোচনা খুবই হইত।

"সে সময়ে কংগ্রেসের দিকপাল ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, উমেশচন্দ্র বোনার্জ্জী, আনন্দমোহন বসু, ফিরোজ সাহ মেটা, ডি, ওয়াচা প্রভৃতি। তাঁহারা বিদ্যায় জ্ঞানে, বাগ্মিতায় ও দেশপ্রেমিকতায় ছিলেন অপূর্ব্ব। সে সময়ে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন পাণ্ডিত্যের এক বিরাট হিমাচল; তিনি কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ধর্ম্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে ছিলেন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি একদিন আমার এক বন্ধুকে বলেন, 'সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কংগ্রেস করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেছেন; ইহা আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অত্যাবশ্যক এবং বিশেষ মঙ্গলকর। কিন্তু ঐজন্য যে পড়াশুনার দরকার ইহারা তাহা করিয়াছেন কি? একমাত্র ওয়াচাই statistics সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। Statistics সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য অবশ্যই খুব মূল্যবান।' কংগ্রেসের মহারথী দিকপালগণের সম্বন্ধেই

মহাপণ্ডিত ডাঃ শীলের মন্তব্য যখন ঐরূপ তখন সামান্য পড়াশুনা করিয়া রাজনীতিক হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রাংশুলভ্য ফলের প্রতি উদ্বাহু বামনের অবস্থার ন্যায় আমাদের অবস্থাও হাস্যকর হয় না কি? মনুষ্যসমাজ অন্ততঃ দশ হাজার বৎসর জ্ঞানের চর্চ্চা করিতেছে। অতীতের মহামানবগণ বর্ত্তমানের মহামানবগণ অপেক্ষা যে চিন্তায় জ্ঞানে, মনুষ্যত্বে কম ছিলেন তাহা মনে করিবার কোন কারণ ত দেখা যায় না। আগে পড়াশুনা কর, পরে রাজনীতিক হইবার চেষ্টা করিও।"

কৃষ্ণদার কথা শুনিয়া পড়াশুনা করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। বিকালের জলখাবারের খরচ হইতে দৈনিক এক পয়সা বাঁচাইয়া মাসিক আট টাকা চাঁদা দিয়া এক গ্রন্থাগারের বা লাইব্রেরীর সভ্য হইলাম। ইংরাজি ও বাংলা ভাষার দৌলতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কোন কোন নীতিবিদের লেখায় এক আধটুকু উঁকি মারিলাম। আমার মনটা বড়ই খুঁত খুঁতে অর্থাৎ মক্ষিকাধর্ম্মী, সব কিছুর মধ্যেই ক্ষতের সন্ধান করিয়া বেড়ানই তাহার স্বভাব। প্লেটোর রিপাবলিকে উঁকি মারিলাম; সক্রেটিস এরিস্টটলের মতেরও কিছু কিছু জানিলাম। কীট পতঙ্গের অনুকরণ করিয়া ভগবানের সৃষ্ট জীবের সর্ব্বপ্রধান মানুষ চলিবে ইহা ভাল লাগিল না। কৌটিল্য ম্যাকিয়াভেলীর মত জানিবার ইচ্ছা হইল। ইতালীর ভাষা জানি না, ম্যাকিয়াভেলীর লেখাও ইংরাজীতে তখন পর্যন্ত অনুদিত হয় নাই। তবে তাঁহার রচিত কোন কোন প্রবন্ধের

সম্বন্ধে কোন কোন ইংরাজ পণ্ডিত কিছু কিছু সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই উঁকি মারিয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার প্রয়াস পাইলাম। কার্ল মার্ক্সের দি ক্যাপিটাল পড়িবার চেষ্টা করিলাম; মনের ওজনে মিলিল না—বিষম সংযোগ বলিয়া মনে হইল। বর্ত্তমানের বহু জ্ঞানী ও কর্ম্মীর শত শত পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ করা ত মনুষ্য পরমায়ুতে কুলায় না। বাইবেলোক্ত Three score and ten, তিন কুড়ি দশে ত কুলায়ই না, বেদোক্ত শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ-তে কুলায় না; পরবর্ত্তী জ্যোতিষীদের অষ্টোত্তর বা বিংশোত্তর শততেও কুলায় না— কাজেই আমার মনোভাবের অনুকূল দুই চারিখানা বই পড়িবার চেষ্টা করিলাম। এইখানে বলিতে হইল কেন কয়বারই উঁকিমারার ও পড়িবার চেষ্টা করার কথা বলিলাম। কারণ, পড়িলাম ত কিন্তু গ্রহণ করিবার শক্তির অভাবে গৃহীত হইল না; বহুদিন পূর্ব্বের দরবেশ কবির কথাই মনে পড়িল,—

"তুমি হে আমার আয়েশের কালে রবি ঠাকুরের কাব্য;
কত যে হেঁয়ালী কিছুই বুঝি না পড়িয়া যেতেছি দিব্য।"

প্রতীচ্য ছাড়িয়া প্রাচ্যের মনীষীদের দরজায় ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইলাম। শুক্রনীতি ও কৌটিল্যনীতিতে উঁকি মারিলাম; মনটা প্রায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ঋষিতুল্য দুই মহামনীষী শুক্রাচার্য্য ও চাণক্য, নীতিকে সুনীতি ও কুনীতি এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন আর যে দুর্নীতি

আজ বিশ্বমানবের উপর পেঁচোরূপে পাইয়া বসিয়াছে বা সিন্ধুবাদরূপী বিশ্বমানবের স্কন্ধে ছাগপদ সামুদ্রিক ভদ্র-লোকটির মত চাপিয়া বসিয়াছে, সেই মহাপ্রবল দুর্নীতির উল্লেখ মাত্র করিলেন না। বন্ধু বলিলেন, "তোমার কান দুটাই লম্বা হইয়াছে; চোখ দুইটা বড় হইলে কাজে লাগিত; দেখিতেছ না দুর্নীতি কুনীতির মধ্যেই লুকাইয়া আছে।" মন মানিল না। দুর্নীতি যে আজ সু কু সব নীতিরই গলা টিপিয়া বিশ্বমানবের উপর একমেবাদ্বিতীয়মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করা যে নিজেকে অস্বীকার করা অপেক্ষাও অসমীচীন।

কুটিল নীতিশাস্ত্র ছাড়িয়া মহাভারতে নজর দিলাম। মহাজ্ঞানী গাঙ্গেয় যেখানে যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে রাজনীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন তাহা পড়িলাম। দেহে দ্ব্যঙ্গুল অন্তরে শরবিদ্ধ হইয়া শরশয্যায় পতিত, নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় অবস্থিত, অষ্টোত্তর বা বিংশোত্তর শত অতি বৃদ্ধ ভীষ্ম বলিতেছেন, শাসনাধীন প্রজাগণের সর্ব্বাঙ্গীন সাধনাই রাজার একমাত্র কর্ত্তব্য। রাজা যদি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া আত্মসুখের বা নামযশের আকাঙ্ক্ষায় প্রজাগণের মঙ্গলসাধনে বিমুখ হ'ন তাহা হইলে সেরূপ রাজাকে নির্ব্বাসিত কর কিম্বা প্রাণে বধ কর। চমকিত হইয়া লাফাইয়া উঠিলাম, ওঃ বাবা এ কি ভয়ানক কথা! ভীষ্ম-ডাক্তারের এই ব্যবস্থা যদি মানিতে হয়, এই প্রেসক্রুপশন যদি সার্ভ করিতে হয় তাহা

হইলে সারা দুনিয়ার অপারেশন টেবিলটা যে লালে লাল হইয়া যায়। মনের অশান্তির ভার নামাইবার জন্য শান্তি-পর্ব্বে ডুব দিলাম।

সারা পৃথিবীর অতীত ও বর্ত্তমান মনীষীগণের লেখা কিছু কিছু যাহা পড়িলাম এবং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা বুঝিলাম তাহাতে মনে হইল ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে রাজা নির্ব্বাচিতই হউন বা স্বপ্রতিষ্ঠই হউন তাঁহার কর্ত্তব্য প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গল সাধন; তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের সেবক। কিন্তু আজকাল দেখা যায় শাসকগণের একমাত্র কার্য্য আত্মসুখ সন্ধান, আত্ম প্রতিষ্ঠা। হিটলার-মুশোলিনীই হউক আর টু্ম্যান-চার্চ্চিলই হউক, সর্ব্বত্রই ঐ আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রয়াস এবং নীতি বিসর্জ্জন। কাজেই রাজনীতিক হইবার বাসনা ত্যাগ করিলাম। কৃষ্ণ-দাদাকে ঐ কথা বলায় তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ভালই করিলে। এতদিনে তুমি মনুষ্যত্ব লাভের পথে প্রথম পদক্ষেপ করিলে।"

কৃষি-প্রসঙ্গে

ভারতে কৃষিকার্য্য নব্যপ্রস্তর যুগের মধ্যেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ; বোধ হয় তাহা চারি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে। তখন লোক ছিল কম, খাদ্য ছিল বেশী ; কাজেই খাদ্যের জন্য প্রাণপণ চেষ্টার প্রয়োজন ছিল না। তবে কৃষিকর্ম্ম বহুশত বৎসর আলস্য বিজড়িত হইয়া চলিয়া আসিলেও মস্তিষ্কবান মনুষ্য তাহার ভাল মন্দ, উন্নতি অবনতি সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়া পারে নাই। তাহাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা 'ডাক পুরুষের কথা', 'খনার বচন' প্রভৃতি নামে সমাজের মধ্যে পরিবেশিত হইয়াছিল। চিন্তাশীল ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা বহু পুস্তক-পুস্তিকাও রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যদিও ঘটনা-চক্রের বিবর্ত্তনে সে সকলের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে তথাপি সন্ধান করিলে দুই চারিখানি পাওয়া যায়। দুইখানি এখনও সহজ লভ্য।

১ম **কৃষিপরাশর**। ইহা একটি ক্ষুদ্রায়তন সংস্কৃত পুস্তিকা। এই পরাশর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাসের জনক কিম্বা স্মৃতিকার পরাশর কিম্বা পরাশর নামক কোন অর্ব্বাচীন ব্যক্তি তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই। তিনি ক্ষেত্রে সার রক্ষণ, কর্ষণ, বীজ সংগ্রহ, বীজ বপন, চারা রোপণ প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি যে সকল কৃষি যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন

তাহার বেশীর ভাগই এখনও প্রচলিত দুই একটি কোন স্থানে লুপ্ত, কোন স্থানে প্রচলিত। বাঁকুড়ায় বিদ্ধক বা বিদের চলন না থাকিলেও নদীয়া, মুরশিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি জেলায় যেখানে বেশী আশুধান্যের চাষ, ধান্যের চারা রোপণ না করিয়া ক্ষেত্রে বীজ ছড়াইয়া করা হয় সেখানে সেই সব জমির কাড়ানের জন্য বিদ্ধক বা বিদে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়া শুনিয়াছি। পরাশর লাঙ্গলের বিভিন্নাংশের উল্লেখ কালে আড্ডচালি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আড়চালি শব্দ বাঁকুড়ায় সুপরিচিত।

২য় কৃষি-বিষয়ক পুস্তক রামেশ্বর প্রণীত **শিবায়ণ**। ভাষা দেখিয়া মনে হয় ইহা মঙ্গলকাব্য রচনাকালের অর্থাৎ দুই কি আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বের। ইহাতে কবি শিবের লাঙ্গল বাঁধিয়া চাষ করার বর্ণনা করিতে গিয়া বাংলা দেশের একটি ভদ্র গৃহস্থ চাষীর নিখুঁত বর্ণনা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় সুপণ্ডিত সাহিত্যিকগণ ঐ সকল পুস্তকে বিশেষ দৃষ্টিক্ষেপ না করায় সেগুলি ক্রমেই বিলুপ্তির পথে চলিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, তাহা হইতে পাঠকগণ দেশের অবস্থা কতকটা বুঝিতে পারিবেন। কবি শিবের লাঙ্গলের অংশ সমূহের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "বাসুকীকে আমোদ করিলেন" নাগরিক সাহিত্য রসিক "আমোদ" শব্দের পর একটি জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?) দিয়া শেষ করিলেন। বাঁকুড়া জেলার মধ্যে চাষী মাত্রেই এখনও আঁওদ শব্দই ব্যবহার করে।

আঁওদ অর্থে সেই কুণ্ডলিত রশিটি যাহা জোয়ালের সহিত ইসের সংযোগ স্থাপন করে। পূর্ব্বে বোধহয় এখনও কোন কোন স্থানে ইহা চর্ম্ম নির্ম্মিত হইত এবং গ্রামের মুচিগণই ইহা তৈয়ার করিয়া দিত। সেজন্য চাষীগণ আঁওদ সরবরাহ-কারী মুচির যযমান আখ্যা পাইত এবং মুচি-পুরোহিত আঁওদের মূল্যের জন্য ডোল পাইত।

ষাঠ-সত্তর বৎসর পূর্ব্বে গ্রামবৃদ্ধগণ কাহাকেও কোন বিষয়ে উপদেশ দিতে হইলেই 'ডাকপুরুষের কথা' বা 'খনার বচন' উল্লেখ করিয়া নিজেদের বাক্যের সমর্থন করিতেন। ঐ সব গ্রামবৃদ্ধের চরিত্র-গাম্ভীর্য্য ও শালীনতা এরূপ ছিল যে এখন অনেক সমাজ-প্রধানের মধ্যেও তাহা ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। ঐ গ্রামবৃদ্ধগণ উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না। সে সময়ে শিশু-বোধক বলিয়া একখানি পুস্তক ছিল; তাহাতে দাতাকর্ণের উপাখ্যান ও অন্যান্য উপাখ্যান ছিল। অনেকেরই শিক্ষা ঐ শিশুবোধকেই শেষ হইত। তাঁহারা শুভঙ্করীর আর্য্যাগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া নিত্যাবশ্যক অঙ্ক প্রণালীতে এরূপ নৈপুণ্য লাভ করিতেন যে কৃষিপ্রধান দেশের যাবতীয় কার্য্য বিঘা-কালি কাঠাকালি, মণকষা, সেরকষা, হারবিশ, মাস মাহিনা প্রভৃতি মুখে মুখে নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করিতেন। দেখিয়াছি এখন একজন বি. এ. এটেষ্টেশন অফিসার এক বিঘা জমির খাজনা যদি ১৵০ হয় তাহা হইলে দেড় কাঠা জমির খাজনা কত হইবে তাহা বাহির করিতে হইলে একখানা বড় কাগজ লইয়া

Rule of three কষিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু পূর্ব্বের গ্রামবৃদ্ধগণের যে কেহ শুভঙ্করের কৃপায় এক দুই মিনিটে মুখে মুখে উহা নির্ণয় করিয়া দিতেন। প্রবীণ নিরক্ষর কৃষকগণেরও ডাকপুরুষের কথা ও খনার বচন জানা ছিল এবং পুত্রাদি তরুণ কৃষকদিগকে উপদেশ দিবার সময় আবৃত্তি করিতেন। মনে পড়ে এক প্রবীণ কৃষক ধানের জন্য জমিতে কয়বার কর্ষণ বা চাষ দেওয়া দরকার তাহা বুঝাইবার জন্য পুত্রকে বলিতেছেন,—

ষোল চাষে মূলো; তার অর্দ্ধেক ধান;
তার অর্দ্ধেক তুলো; বিনা চাষে পান।

এখন অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে ঐ সকল কথা ও বচনগুলি এরূপ বিরল হইয়াছে যে মনে হয় সেগুলি বিলুপ্ত হইতে আর বেশী দেরী নাই।

বর্ত্তমানে যদি এইসব কথা ও বচন সংগ্রহ করা যায় তাহা হইলে খুবই মঙ্গলকর হইবে; কারণ তাহাতে নগরবাসী ও পল্লীবাসীর মধ্যে সংযোগ সেতু রচনার গোড়াপত্তন হইবে মনে করি। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের মাটিতে সহজেই নব নব জাতির উৎপত্তি হয়। প্রথমে ছিল শাস্ত্রোক্ত চারি জাতি;—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। ঐ জাতিভেদও প্রথমে জন্মগত ছিল না। উহা ছিল গুণ কর্ম্মানুযায়ী, পরে ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অন্য জাতি

হইল ; প্রথম চারি জাতির পরে হইল বলিয়া মাদ্রাজ প্রদেশে তাহারা হইল পঞ্চম এবং চারি জাতির অন্তে বলিয়া বাংলায় হইল অন্ত্যজ। চারি পাঁচটি জাতি হইলে তবুও রক্ষা ছিল ; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে জাতি সংখ্যা এখন পাঁচ হাজারেও কুলায় না। এক ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে আড়াই তিন হাজার ভিন্ন জাতি যাহারা পরস্পর অন্নভোজ্যও নয়। ইংরাজ আধিপত্যের দেড় দুইশত বর্ষেও অনেক জাতি জন্মিয়াছে তাহার মধ্যে চারিটি প্রধান শিক্ষিত অশিক্ষিত (educated and uneducated) ও নাগরিক ও পল্লীবাসী (urban and rural)—ইহারা পরস্পরকে বুঝে না জানে না। এই জাতিসমূহের বিলুপ্তি না হইলে অখণ্ড ভারত কল্পনাতেই থাকিয়া যাইবে। যদি বহুলোক ঐ পথে চলিতে থাকে তাহা হইলে ভবিষ্যতে নাগরিক ও পল্লীবাসী জাতিদ্বয়ের লোপ পাইবার আশা হয়।

কেহ কেহ ঐ সকল বাক্য ও বচন উদ্ধারের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন সে বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। কৃষি বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারীগণকে ডাকের কথা ও খনার বচন সংগ্রহের ভার দিলে সেগুলির কোন দিনই সংগ্রহ হইবে না, হইবে শুধু কৃষিজীবিদের কতকটুকু সময় নষ্ট এবং অনেকখানি দুর্ভোগ। পল্লীগ্রামের কৃষকদের মধ্যে কোন সরকারী কর্ম্মচারীর আগমন মেষের পালে নেকড়ের আগমনেরই অনুরূপ। তাঁহার চা সিগারেট

সংগ্রহ করিতেই কৃষকগণ বিব্রত হইবে। যদি ঐ সকল কথা ও বচনগুলির সংগ্রহ সাধন করিতে হয় তাহা হইলে কোন তরুণ শ্রদ্ধাবান সাহিত্য-সেবীর উপর ভার দেওয়াই কর্ত্তব্য; শ্রদ্ধা থাকিলে গম্যে পৌঁছান যায়, না থাকিলে পথ চলাও হয় না।

কোন রাজপুরুষকে ঐ কার্য্যের ভার দিলে কৃষির ক্ষতি হইবে; ইহা আমার কথা নয়, অতীত ভারতের মনীষীদেরই কথা। সব কাজেরই যেমন নানা বাধাবিঘ্ন থাকে কৃষিকর্ম্মেও তেমনি কতকগুলি বিঘ্ন আছে; সংস্কৃত ভাষায় সেগুলিকে ঈতি বলে। ছয়টি ঈতি এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে;

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টির্মূষিকাঃ শলভাঃ শুকাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতি ঈতয়ঃস্মৃতা॥

১। **অতিবৃষ্টি**—অতিবর্ষণ ও তজ্জনিত বন্যায় উত্তর বঙ্গ আসাম ও উত্তর বিহারের ফসলের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে তাহা সুবিদিত।

২। **অনাবৃষ্টি**—বাঁকুড়া জেলাবাসী এ বিষয়ে ভুক্তভোগী। এ জেলায় বৃষ্টির অভাবে অজন্মা বা আংশিক অজন্মা প্রায়ই হয়।

৩। **মুষিক**—মাঠের ইঁদুরে পাকা ধানের শীষগুলি কাটিয়া লইয়া তাহাদের গর্ত্তের মধ্যে চলিয়া যায়, তাহাতে বহু ক্ষতি হয়; যে জমিতে ছয় মন পাইবার সম্ভাবনা ছিল তাহাতে ইঁদুর লাগিলে এক দেড়মণ ধানও পাওয়া যায় না। ধান্য কর্ত্তন ও

খামারে আনয়ন শেষ হইলে সাঁওতাল বাউরী প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা ইঁদুর গর্ত্তে জল ঢালিয়া বা ধূম্র দিয়া ইঁদুরগুলিকে বাহির করিয়া মারিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করে এবং গর্ত্তগুলি খুড়িয়া ধান্য বাহির করিয়া লয়। এক একটি গর্ত্ত হইতে এক দেড় মণ পর্য্যন্ত ধান্য পাওয়া যায়।

৪। **শলভ**—পঙ্গপাল পতঙ্গ বিশেষ। পঙ্গপালে পাঁচ ছয় ক্রোশ দীর্ঘ ও এক দেড় ক্রোশ প্রস্থ ভূখণ্ডের সমস্ত ফসল এবং বৃক্ষাদি নষ্ট করে।

৫। **শুকা**—দৃঢ় ও বক্র চঞ্চুযুক্ত টিয়া জাতীয় পক্ষী। বিহার ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এগুলিকে শুগা বলে; বাংলা দেশে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীয়কে টিয়া, চন্দনা ফুলটুসি প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়। ইহারা ধান্য, মকাই, জনার প্রভৃতি শস্যের খায় খুবই কম কিন্তু শীষগুলি ঠোঁট দিয়া কাটিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া নষ্ট করে প্রচুর।

অনিষ্টকারী বন্য পশু পক্ষীর কবল হইতে শস্য রক্ষার জন্য রক্ষিনী নিযুক্ত হইত। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ জাতকে ঈতির ও ক্ষেত্র রক্ষিনীর উল্লেখ দেখা যায়। দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বের মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন,—

ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তু র্গুণোদয়ম্।
আকুমারকথোদ্‌ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ

কৃষকনারীগণ ইক্ষুর ছায়াতে বসিয়া শস্য রক্ষা করিতে করিতে

রঘুর আশৈব জীবনের গুণ গান করিত। বর্ত্তমানেও বাঁকুড়া, মানভূম, ধলভূম, রাঁচি, হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থানে বনভূমির নিকটবর্ত্তী শস্যক্ষেত্রগুলির শস্য রক্ষার জন্য রক্ষয়িত্রী নিয়োগ করা হয়। কালিদাসের সময়ে কৃষক রমণীগণই ঐ কার্য্য করিত; এখনও কৃষক পরিবারের নারীগণ ও বালক বালিকাগণই ঐ কার্য্য করে; সেজন্য ডাকের কথাতেও বলে "গোরু জরু ধান এ তিন রাখবে আপন বিদ্যমান।"

৬। **প্রত্যাসন্নশ্চ রাজানঃ**—ইহার অর্থ লইয়া মতভেদ আছে, সোজা অর্থ রাজগণের সান্নিধ্য। কেহ কেহ বলেন যুদ্ধোদ্যত রাজা। ভিন্ন দেশ হইতে যুদ্ধকামী রাজা আসিয়া দেশের রাজার সহিত যুদ্ধ বাধাইলে কৃষিকর্ম্মের বিশেষ ক্ষতি হয়; তাহাতে এই বিষয়ে কথাও আছে "ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই হয়, উলু খড়ের পরাণ বেরোয়।" অন্যেরা বলেন রাজানঃ যখন বহুবচন তখন ঐরূপ অর্থ হইতে পারে না। বিদেশী রাজা ও দেশী রাজায় লড়াই দুইজনের লড়াই, ঐ অর্থ হইলে শব্দটি দ্বিবচন হইত। তাঁহারা অর্থ করেন রাজানঃ অর্থে রাজপুরুষ বা রাজকর্ম্মচারিগণ এবং প্রত্যাসন্নাঃ মানে সন্নিহিত বা ঘাড়ের উপর আগত। সরকারী কর্ম্মচারীগণের সান্নিধ্য যে কৃষিকর্ম্মের বিঘ্ন তাহা অনেকেই অনুভব করেন। মনে হয় ঐরূপ না হইয়াই পারে না। সরকারী কর্ম্মচারীদের পুঁথিগত কৃষিজ্ঞান কৃষকের হাল-হেথেরের কৃষিজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খায় না। এদিকে সরকারী লোক কৃষকের উপর হুকুম

চালান পদ গৌরবের জন্য ; সরকারী লোকের হুকুম রক্ষিত হয় বলিয়া কৃষির বিঘ্ন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

অতঃপর দেশ প্রচলিত কৃষি সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিব। কৃষি বিষয়ে বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের সাহায্যে বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইউরোপের বহুদেশে, আমেরিকা কানাডা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে কৃষির বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা এবং তাহাদের মানসিক শক্তি ও কর্ম্মশক্তির তারতম্য হেতু দেশের কৃষির উন্নতির তারতম্য হয়। বহু কারণের সমবায়ে ভারতবাসী দরিদ্র, উদ্যমহীন, অলস। ঐ বহু কারণের মধ্যে জন্মগত জাতি ও গোষ্ঠি-বিভাগ ভারতবাসীর অবনতির একটি বিশিষ্ট কারণ। ঐ কারণে ভারতবাসী ছন্নছাড়া, দুর্ব্বল ও দরিদ্র হইয়া পড়ে। পরে উৎসাহসম্পন্ন বিদেশীদের দ্বারা পরাজিত ও পরাভূত হয়। বহুশত বৎসর পর জাতির শাসনাধীন হওয়ায় উচ্চ মানসিকতার অভাব হয় এবং ভারতবাসী ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, নীচ স্বার্থপরতা, প্রভৃতি দোষের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী শাসক ইংরাজ ভারত ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং দেশের শাসনভার দেশবাসীর হস্তে আসিয়াছে। স্বদেশী শাসকবর্গ ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কৃষির উন্নতির জন্য বহু সুনিশ্চিত কার্য্য হইতেছে। সকলেই দেখিতেছেন কৃষির উন্নতিও কিছু

হইয়াছে। তবে বহুদিনের আবর্জ্জনা দূর করিয়া ঘরটিকে সর্ব্বপ্রকারে বাসোপযোগী করিতে সময় লাগিবে। শুধু সরকারের চেষ্টাতেই উন্নতি আসিবে না। দেশবাসী যদি উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্মশক্তির বৃদ্ধি করিয়া সরকারের সহ-যোগিতা করে তবেই বাঞ্ছিত উন্নতি লাভ সম্ভবপর হইবে।

কৃষির জন্য আবশ্যক (১) ভূমি, (২) রস বা জল, (৩) কৃষি-যন্ত্র, (৪) শ্রমিক, (৫) সার বীজ। সবগুলি সুসমঞ্জস ও ভাল হইলে আশানুরূপ ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাংলা দেশের অধিকাংশ ভূমি নব্য শিকস্তি (recent alluvium), পূর্ব্ববঙ্গের ভূমির অধিকাংশই গঙ্গানদীর delta বা বদ্বীপ সঞ্জাত। কোন কৃষি পণ্ডিতের মতে গঙ্গার 'ডেলটা' বা বদ্বীপ, ভূমি হিসাবে সর্ব্বোত্তম। মিসিসিপি নদীর বদ্বীপভূমি, নীল নদের বদ্বীপ, কাবেরীর বদ্বীপ, চীন দেশের ইয়ালো নদীর ভূমি গঙ্গার বদ্বীপের ভূমির ন্যায় উৎকৃষ্ট নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা দেশ বিভক্ত হওয়ায় গঙ্গানদীর বদ্বীপ-ভূমির অধিকাংশই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে ভাগীরথী নদীর তীরভূমি নব্য শিকস্তি। ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, নবদ্বীপ, বর্দ্ধমানের উত্তারাংশ, বীরভূমের উত্তর পূর্ব্বাংশ উর্ব্বরা। কংসাবতী, শীলাবতী, সুবর্ণরেখা, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদ-নদীর পলি সঞ্চয় হেতু মেদিনীপুরের অধিকাংশ ভূমি উর্ব্বরা। নব্য শিকস্তি ভূমি সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়। ১। পলি, ২। দোআঁশ, ৩। এটেল

বা মেটেল, ও ৪। বালি বা বেলে মাটি। পলি মাটিই নানা জাতীয় ফসলের উৎপন্নের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহার পর দোআঁশ; জলের ব্যবস্থা করিতে পারিলে মেটেল মাটিতে ধান্য উৎপন্ন ভালই হয়। তবে বর্ষাকালে কাদা খুব বেশী হওয়ায় মেটেল মাটির গ্রামবাসীদের খুবই কষ্ট হয়। জল শুকালেই মেটেল মাটীর জমিতে বড় বড় ফাট হয় এবং সেজন্য তাহাতে রবিশস্য উৎপাদন বহু শ্রম সাপেক্ষ। বালি মাটিতে বালির ভাগের তারতম্য হয়। যাহাতে বালির ভাগ বেশী তাহা খুবই অনুর্ব্বর এবং তাহাতে বহু শ্রমে ও অর্থব্যয়ে যে সকল ফসল উৎপন্ন হয় তাহার পরিমাণ কম। তবে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য বিধানে কোন শ্রেণীর ভূমিই নিরবচ্ছিন্ন ভাল বা নিরবচ্ছিন্ন মন্দ নহে। সব শ্রেণীর ভূমিরই সুবিধা অসুবিধা আছে; কোন শ্রেণীতে সুবিধা বেশী, কোনটিতে অসুবিধা বেশী। পল্লীবাসীগণ তাহাদের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ভূমি সম্বন্ধে যে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। ভূমি কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহাও ডাকের কথায় প্রকাশ পাইয়াছে—"বালিতে বাস মেটেলে চাষ, তার সুখ বারো মাস।" পল্লীবাসী ইহার ভালরূপে জানে যে বালি মাটিতে দীঘি পুষ্করিণী আদির পুরাতন পাঁক এবং মেটেল মাটিতে পাঁকা সার রূপে ব্যবহার করিলে ফসল ভাল হয় এবং মাটিও ক্রমশঃ দোআঁশে পরিণত হইবার পথে আগাইয়া চলে।

নব্য শিকস্তি ভূমি ভিন্ন বাংলাদেশের কোন স্থানের কোন

ভূমি formed soil অর্থাৎ বহু পূর্ব্বের রচিত ভূমি। ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্ব্ব দিকের ঢলে (Eastern slope) বাংলা দেশের যে যে অংশ পড়িয়াছে তাহার মাটি ঐরূপ। ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্ব্বদিকের ঢলে পড়িয়াছে বীরভূমের পশ্চিমাংশ, বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমা, বাঁকুড়া জেলার সদর মহকুমার অধিকাংশ ও বিষ্ণুপুর মহকুমার পশ্চিমাংশ এবং মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমদিকের কিয়দংশ। ঐ সকল ভূমি প্রস্তর কঙ্করময় ও উচ্চাবচ। ঐ সকল ভূমির মধ্যের লাল মাটি বেশ উর্ব্বরা। উহাতে সার ও জল দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ফসল ভালই হয়। কাঁকর বা বাঁকুড়ার ভাষায় কল্লাচ (laterite) প্রস্তর বা stony formation, নয়। উহা anti-alluvion alluvium অর্থাৎ মহাপ্লাবনের পূর্ব্বের শুষ্ক পলি মাটি। চাষীগণ ভাল-রূপেই জানে যে কল্লাচভূমিতে চারিদিকে আইল দিয়া কেদারখণ্ড তৈয়ার করিয়া তাহাতে সার দিয়া জল বাঁধিয়া রাখিলে কল্লাচ পচিয়া যায় এবং ঐভাবে যে মাটি তৈয়ার হয় তাহার উর্ব্বরতা খুব বেশী।

নব্য শিকস্তি প্রায় সমতল। সেখানের ক্ষেত্রসমূহ পূর্ব্বে বিরিডাঙ্গা আউশেডাঙ্গা, কেলেশী, দো প্রভৃতি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিলেও বর্ত্তমানে শালি ও বাইদ এই দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত। ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্ব্বঢলে উচ্চাবচ ভূখণ্ডে যে সকল ক্ষেত্র রচিত হইয়াছে তাহা শোল, কানালী, বাইদ,

ডাঙ্গা ও তড়া শ্রেণীতে বিভক্ত। ঐসকল বিভিন্ন শ্রেণীর জমির উৎপাদন শক্তির তারতম্য বিস্ময়কর। শোল জমির এক বিঘায় বার তের মণ পর্য্যন্ত ধান্য উৎপন্ন হয় কিন্তু ডাঙ্গা জমিতে দেড় দুই মণের বেশী উৎপন্ন হয় না।

ডাঙ্গা ও বাইদ শ্রেণীর যে সকল জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে সেগুলি দো বা দো ফসলী জমিরূপে ব্যবহৃত হয়। সেচের ব্যবস্থার অভাবে দো জমির পরিমাণ খুব কম। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের জাতীয় সরকার বহু অর্থব্যয়ে হাজা মজা পুষ্করিণীর উদ্ধার সাধন করিতেছেন এবং দামোদর, অজয় কংসাবতী প্রভৃতি বহু নদীতে সুপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থা করিতেছেন। ঐ সকল সম্পূর্ণ হইলে দো জমির পরিমাণ অনেক বর্দ্ধিত হইবে এবং নানা জাতীয় রবি খন্দের সহিত ইক্ষু, আলু, গম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইবে। যে সকল লোক মক্ষিকা ধর্ম্ম বা তথা কথিত রাজনীতিক গোলমাল 'দে মা লুটেপুটে খাই' নীতির বা দুর্নীতির অনুসরণ করিয়া চলে তাহারা মিছে কথা বা ছলনার ধাপ্পাবাজীর দ্বারা নিরক্ষর কৃষীজীবিকে প্রতারিত করিয়া সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করে। আমাদের দেশের কৃষিজীবী-গণ নিরক্ষর হইলেও বুদ্ধিমান। তাহাদের অনেকেরই সহজ বুদ্ধি বিস্ময়কর। তাহারা পরের মুখে ঝাল না খাইয়া নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা নিজেদের ভালমন্দ স্থির করিবে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ জমি উষর বা নীরস। ঐসকল জমিতে humus বা পচ ধরাইতে পারিলে জমির বিশেষরূপ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। নীরস জমিতে সেচ দিলে মাটি দুই-তিন দিনে শুকাইয়া হাড়ের মত শক্ত হয়, এবং তিন-চারিদিন পরে পুনরায় সেচ দেওয়া আবশ্যক হয়। কিন্তু ঐ জমিতে humus বা পচ ধরাইতে পারিলে দশ-বার দিন পরেও সেচ দিলে ফসলের কোন ক্ষতি হয় না। উষর জমিতে পচ ধরাইবার ব্রহ্মাস্ত্র পুরাতন দীঘি-পুষ্করিণীর পাঁক সার রূপে ব্যবহার। বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার পল্লী-অংশে অগণিত পুরাতন পুষ্করিণী রহিয়াছে; পল্লীবাসীগণ পাঁকের মূল্য বুঝে। তাহারা আরও জানে যে পুরাতন পুষ্করিণীগুলির পঙ্ক ঐভাবে জনমঙ্গলকার্য্যে ব্যবহৃত হইলে পুষ্করিণীগুলিতে বর্ত্তমানে বর্ষাকালে যে পরিমাণ জল জমে তাহার দুই-তিন গুণ জল জমিবে। তাহাতে দেশের পানের, স্নানের ও সেচের জলের প্রাচুর্য্য হইবে। গৃহপালিত পশুগণ স্নান করিতে পাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইবে। দেশের দুরন্ত শত্রু ম্যালেরিয়াও অনেকটা কম হইবে। বড়ই দুঃখের বিষয় হিংসা-বিদ্বেষ জর্জ্জরিত সংকীর্ণ মানসিকতার জন্য তাহা হইতে পারে না। এক-একটি পুষ্করিণীর মালিক পঁচিশ ত্রিশ জন। সকলের অবস্থা সমান নয়। যিনি অবস্থাপন্ন তাঁহার চেষ্টা পুষ্করিণীটির ষোল আনা মালিকী স্বত্ব অর্জ্জন করা; এবং সেজন্য পুষ্করিণীটিকে পড়া বা উৎপন্ন হীন করিয়া রাখাই

তাহার একমাত্র লক্ষ্য; ঐভাবে শত শত পুষ্করিণীর সংস্কার সহজ সাধ্যের মুখে থাকিলে ও সেগুলির সংস্কার হইতেছে না।

একবার একজন উচ্চপদস্থ চিন্তাশীল ব্যক্তি আমায় বলেন, "ম্যালেরিরা দেশ হইতে উৎসাদিত না হইলে দেশের কোন উন্নতিই সাধিত হইবে না।" আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ ম্যালেরিয়ার কথা বলিতেছেন?' তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ম্যালেরিয়া তো একটাই!" আমি বলিলাম, দুই-প্রকার ম্যালেরিয়া আমাদের দেশে দেখা যায়; দেহের ম্যালেরিয়া ও মনের ম্যালেরিয়া। তাহার মধ্যে মনের ম্যালেরিয়াই অধিক সর্ব্বনাশ করে, তাহাতেই আমরা উচ্ছিন্ন হইয়া রসাতলে যাইতে বসিয়াছি। মনের ম্যালেরিয়া যদি বিদূরিত হয়, দেহের ম্যালেরিয়া সূর্য্যোদয়ে নৈশ অন্ধকারের মত মূহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া যাইবে। সারা জীবনের নিষ্ফল চেষ্টার বোঝা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া ও বিষয়ের চিন্তাই বৃথা ও ক্লেশদায়ক। একটি কথা মনে উদয় হয়। তাহা ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা; তিনি অহেতুকী কৃপায় আমাদের মনের ম্যালেরিয়া দূর করিয়া আমাদিগকে মনুষ্যত্বের পথে, চালিত করুন। কিন্তু ঐ পথটিও ত বিকৃত অদৃষ্টবাদের স্রোতে হাত পা ছাড়িয়া ভাসিয়া যাওয়ার বা অচলায়তনতার নামান্তর। আমরা পড়িয়াছি শাঁখারীর করাতের মাঝে; আগাইলে আঁটকুড়ো, পিছাইলে নির্ব্বংশ। উৎসাহ সম্পন্ন

তরুণের দল কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া না পড়িলে দেশের অমঙ্গল দূরীকরণের কোন আশাই দেখি না।

কৃষির প্রসঙ্গে বাসভূমির কথা, বাসের ভালমন্দের কথা যাহা ডাকের কথায় পাইয়াছি তাহা জানাইয়া কৃষি-প্রসঙ্গ শেষ করিব মনে করিতেছি; যদিও ভূমি মা-মাটির কথা শেষ হয় না। যখন জগতে আসিলাম তখন ভূমিষ্ঠ হইলাম অর্থাৎ মাটির কোলে আসিলাম; যে কয়টা বৎসর কর্ম্মফল ভোগে রত থাকিলাম, মাটির দেওয়া ফল, জল, অন্নেই বাঁচিলাম; শেষে মাটির কোলেই চিতাশয্যায় শুইলাম। মাটির কথা শেষ হয় না। যাক্ এখন বাসভূমির কথাই বলি। ডাক বলিতেছেন,—"পূবে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ, তবেই হয় সুখের বাস"। বাড়ীর পূর্ব্বদিকে পুষ্করিণী থাকিলে বাস্তু ও বাসগৃহ আরামদায়ক হয়। বৎসরের অনেক সময়েই আমাদের দেশে পূর্ব্ব দক্ষিণে বায়ু বহে; সলিল-শিকরসিক্ত বায়ু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খুবই বাঞ্ছনীয়। পশ্চিমের প্রবল হাওয়ায় ঘরগুলির খড়ের আচ্ছাদনের এবং ভিটাস্থ আম, জাম, পেয়ারা, সজিনা প্রভৃতি গাছের প্রভূত ক্ষতি হয়। বাস্তুভূমির পশ্চিমের পগারে যদি ঘন সন্নিবিষ্ট বংশ-বীথিকা থাকে তাহা হইলে ঐ বাঁশ বায়ু নিরোধের বা wind break-এর কার্য্য করে। নানা-কারণে বাঁশ বঙ্গ-পল্লীবাসীর নিকট বিশেষ মূল্যবান। ডাক পুরুষও তাই বাঁশের কথা বহুরূপেই বলিয়াছেন। "ফাগুনে

আগুন চৈতে মাটি, তোকে রেখে তোর ঠাকুর্দ্দাকে কাটি।” বাঁশের ঠাকুরদা অর্থাৎ তিনসনি বাঁশই সুপক্ক এবং গৃহ-নির্ম্মাণাদি কার্য্যের বিশেষ উপযোগী। “দাতার নারিকেল, বখীলের বাঁশ”, কথাটি বাঁশ যে বিশেষ যত্নের জিনিষ তাহা প্রকাশ করে। খড়-আচ্ছাদিত মাটির দেওয়ালের ঘরগুলির দ্বার বা দরজা কোন মুখে হইল ঘরগুলির আরামদায়কত্বের তারতম্য ঘটিবে ডাক-পুরুষ সে কথাও বলিয়াছেন,—

“দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা, পশ্চিম দুয়ারী তাজাতোজা,
উত্তর দুয়ারী ঘরের পাপ, পশ্চিম দুয়ারী সদাই তাপ।”

ডাক-পুরুষ বলিলেন “পূবে হাঁস”। জল বা পুষ্করিণী বুঝাইবার জন্য অন্য কোন শব্দ ব্যবহার না করিয়া হাঁস শব্দ প্রয়োগ করার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে বলিয়াই মনে হয়। হাঁস পল্লীবাসীর বিশেষ প্রয়োজনীয় জীব। যে গ্রামে বেশীরূপ হাঁস আছে সে গ্রামে ম্যালেরিয়া কম হয়; হাঁসগুলি ম্যালেরিয়ার বাহক মশকের জীবাণুগুলি খাইয়া ফেলায় মশক কম হয়। হাঁসগুলি যেসব পুকুরে থাকে তাহাতে জলজ উদ্ভিদ বেশী জন্মিতে পারে না হাঁসে সেগুলি খাইয়া ফেলে। পুষ্করিণী পরিস্কার থাকায় তাহাতে মাছ বেশী জন্মে। হাঁসগুলি বাস্তুভিটার আবর্জ্জনা ও পোকা-মাকড় খাইয়া ফেলিয়া স্থানটিকে পরিষ্কার রাখে। হাঁস ডিম দেয়, তাহা বলকারক খাদ্য। এক-একটি হংসী মাসে দশটি হইতে কুড়িটি ডিম দেয়। হংসের মাংস হিন্দুদের নিষিদ্ধ মাংস নয়। দেখিয়াছি অনেক

সম্বলহীনা ভদ্র অবীরা আট দশটি হাঁস পালন করেন। ডিমগুলি বিক্রয় করিয়া তাহাদের নুন, তেল, মরিচ-মসলা মূলা, বেগুন প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। হাঁসের মল উচ্চশ্রেণীর সার। উহার সাহায্যে ভিটার মধ্যে লাউ, ছাঁচি কুমড়া, সীম, পুঁইশাক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। হাঁস যে পূর্ব্বে পল্লীগৃহে খুবই প্রচলিত ছিল তাহা প্রবচন ও ব্রত কথাদিতে প্রকটিত। ব্রহ্মা হংস-বাহন, সরস্বতীর বাহনও হংস। সুবচনীর ব্রত-কথার ঘোড়া হাঁসের কথা এখনও বহুজনকে আনন্দ দান করে। "জামাই-এর নামে মেরে হাঁস, গোষ্ঠিশুদ্ধ খায় মাস" প্রবচন রূপে দেখা যায়। একজনের জন্য বা দ্বারা কাজ হইলেও বহুলোকে তাহার ফলভোগ করে এই তথ্যটি কিরূপ জোরের সহিত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

মহাভারতে দেখা যায় সর্ব্বত্যাগী একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দান করিতে করিতে বলিয়াছেন কৃষিজীবী প্রজাগণের কৃষিকর্ম্মের সুবিধার জন্য সেচের ব্যবস্থা করা রাজার কর্ত্তব্য। মনু, যাজ্ঞবল্ক, চাণক্য, শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি মহামনীষীগণও বলিয়াছেন সেচের জলের ব্যবস্থা করা রাজার কর্ত্তব্য। অতীতের ভগ্নাবশেষ যাহা আছে তাহা হইতে বোঝা যায় ধার্ম্মিক রাজাগণও তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালনে সচেষ্ট ছিলেন। কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার জন্য দীঘি, পুষ্করিণী, বাঁধ

প্রভৃতি জলাশয় যে নির্ম্মীত হইত তাহা সুবিদিত। এখনও সেচ ব্যবস্থার দুই-চারিটি জলাশয় তৈয়ার হইতে দেখা যায়। খাল কাটিয়া সদানীরা নদীসকল হইতে জল আনিয়া ক্ষেত্র সিঞ্চনের ব্যবস্থা যে একেবারে হইত না তাহা বলা চলে না। "খাল কাটিয়া কুমীর আনা" অর্থাৎ মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিয়া অমঙ্গলকেও ডাকিয়া আনা প্রবচনের ন্যায় প্রচলিত। ইংরাজ আমলের পূর্ব্বেও বাঁকুড়ায় শুভঙ্করের দাঁড়া এবং হুগলী প্রভৃতি জেলায় জন্য খাল, খানা প্রভৃতির অস্তিত্ব সংস্কারাভাবে মলিন হইলেও এখনও আছে। ইংরাজের আমলে পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতিতে স্থানে স্থানে সেচের খাল নির্ম্মিত হইয়া ছিল। বাংলার বর্দ্ধমান জেলায় ইডেন ক্যানাল ও দামোদর ক্যানাল সেচের জন্য রক্ষিত হইয়াছিল। যে সকল জমিতে ঐসব খাল হইতে জল পায় তাহাতে সেচ না পাওয়া জমি হইতে অধিক শস্য উৎপন্ন হয়। আমাদের স্বদেশী শাসনের এই কয়বৎসরে বহু অর্থব্যয়ে ভারতের বহু প্রদেশে সুপরিকল্পিত সেচের ব্যবস্থা রচিত হইতেছে। বাংলাদেশে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন (ডি, ভি, সি,) ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা, কংশাবতী পরিকল্পনা প্রভৃতিতে কার্য্য চলিতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে এখন যে পরিমাণ জমিতে সেচের জল পায় তাহার বহুগুণ জমিতে সেচের জল পাইবে। অনেকে মনে করেন ঐসব হইলে ভারতের খাদ্যাভাব বিদুরিত হইবে।

একজন বিজ্ঞ ইংরাজ Irrigation engineer লিখিয়াছেন ভগীরথই মানবেতিহাসে আদিকৃতি ও মনীষী irrigation engineer—তিনিই গঙ্গা হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত একটি খাল কাটিয়া এবং তাহার বহু শাখা-প্রশাখা রচনা করিয়া বঙ্গের একটি বিশিষ্ট অংশের সেচের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উহা এরূপ সুপরিকল্পিত ও সুনির্ম্মিত হইয়াছিল যে বহুশত বৎসর সংস্কারহীন অবস্থায় থাকিলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। কথাটা অনেকের নিকট হাস্যকর বিবেচিত হইলেও এবং প্রকৃত সত্য কল্পনা ও কিম্বদন্তীর কালো আবরণে আবৃত হইলেও যেন উহার মধ্য হইতে একটা আবছা আলোর আভাস পাওয়া যায়।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে আর্য্যগণ উত্তর হইতে ভারত আসিয়া সিন্ধুতীরেই প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারা বলেন সীডিয় ও পারসিকগণের 'স'-র স্থানে হ উচ্চারণ করার জন্যই সিন্ধু হইতে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আর্য্যদের প্রথম উপনিবেশ সিন্ধুতীরে হইলেও গঙ্গাতীরেই আর্য্য সভ্যতা পূর্ণ বিকশিত হইয়াছিল ; বেদের কতকাংশ উপনিষদ, দর্শন, সংহিতা, পুরাণাদি গঙ্গাতীরকে আশ্রয় করিয়াই উদ্ভূত হইয়াছিল, গঙ্গা সেইজন্য ভারতীয় আর্য্য বা হিন্দুগণের দ্বারা বিশেষভাবে পূজিতা। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে রহিয়াছে—"সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্ব্ব বেদময়ো মনুঃ।" তাহার পরেই পাই,—

গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদিস্থিতে।
চতুর্থকার সংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

বাল্মিকী ও শঙ্করাচার্য্য দুইজনেই গঙ্গার স্তব রচনা করিয়াছেন। বাল্মিকী রামচন্দ্রের সমসাময়িক, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে। বহু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতের মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খৃষ্ট জন্মের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, এবং শঙ্কারাচার্য্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে জন্মিয়াছিলেন; কাজেই দুইজনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ২৩০০ বৎসরেরও অনেক বেশী অথচ গঙ্গার প্রতি ভক্তি নিবেদনে দুইজনেই সমতুল্য। ঋষি বাল্মিকী বলিয়াছেন, "গঙ্গাতীরে শরঠ করট হইয়া জন্মানও বাঞ্ছনীয়; গঙ্গা হইতে দূরে ঘণ্টাধ্বনিযুক্ত বহু হস্তী সমন্বিত প্রবল প্রতাপ রাজা হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়; শঙ্করাচার্য্যও ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন। গঙ্গাতীরে বাস হিন্দুর যে বিশেষ বাঞ্ছিত তাহা সুবিদিত। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের অভিমত যে যাঁহারা নিত্য গঙ্গার স্রোতজলে স্নান করেন এবং তাহা পান করেন তাঁহাদের বুদ্ধি প্রখরা হয়। এবং হৃদয় মহত্ত্ব উচ্চস্তরের হয়। অন্য নদীতে স্নান পানের ফল গঙ্গাজলে স্নান পানের সমান হয় না। বিহারে নিরক্ষর পল্লীবাসীদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে তাহাতেও ঐ কথাই বলা হইয়াছে। তাহারা বলে,—

গঙ্গা নাহানে সব পূনম্ পাওয়ে নদী নাহানে আধধা।
তালাও নাহানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কুয়া নাহানে গাধধা॥

গঙ্গোদক গ্রহণের মন্ত্রটি এইরূপ ঃ—

গাঙ্গং বারি মনোহারী মুরারি চরণচ্যুতম্।
ত্রিপুরারি শিরশ্চারী পাপহারী পুঘাতু সাম্॥

গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা বা মুরারী চরণচ্যুতা হইয়া শিবের জটাজালের মধ্যে কিছুদিন আবদ্ধা থাকেন ইহাই শাস্ত্র বাক্য। দেখা যায় ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। মুরারীর চরণ বা শ্রীভগবানের চরণ মানবের অদৃশ্য; কোথা হইতে গঙ্গা নিঃসৃতা হইয়াছেন মানুষে তাহা দেখিতে পায় না। তাহার পর তিনি রজতগিরিসন্নিভ বা হিমগিরিরূপী শিবের জটায় বা কানন কন্দরে কিছু দিন ভ্রমণ করিয়া গঙ্গোত্রীতে মানবের দৃষ্টিভূতা হ'ন। তাহার পর হরিদ্বার পথে তিনি আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করিয়া প্রয়াগ, বারানসী প্রভৃতি স্থান সমূহকে পবিত্র তীর্থে পরিণত করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছেন। একথা বহু পূর্ব্ব হইতেই শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত, এখন দেখা যায় হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া মুর্শিদাবাদের উত্তরে সেখান হইতে ভাগীরথী দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছেন। সে অংশের নাম সর্ব্বত্রই গঙ্গা। দক্ষিণ মুখে গমন করিয়া যে স্রোত বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে তাহার নাম ভাগীরথী বা হুগলী নদী। গঙ্গা-ভাগীরথীর মিলনস্থান হইতে গঙ্গার যে বৃহদাংশটি পূর্ব্বমুখে চলিয়া গেল তাহার নাম হইল পদ্মা। তাহার পবিত্রতার

উল্লেখ নাই। পদ্মাতীরের হিন্দুগণ পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য বহু কষ্ট সহ্য করিয়া গঙ্গা বা ভাগীরথীতে স্নান করিতে আসিয়া থাকেন। এখন প্রশ্ন উঠে, ভগীরথ কোন্ গঙ্গাকে আনিয়াছিলেন? আর এই ভগীরথইবা কে? ইনি কি বাল্মীকি রামায়ণে দিলীপের পুত্র ভাগীরথ নাম ধেয় কোন পরবর্ত্তী ব্যক্তি? বাংলার কবিগণ ভগীরথের গঙ্গানয়ন সম্বন্ধে খুব বিষাদভাবেই লিখিয়াছেন। ভগীরথ গঙ্গা আনয়নের জন্য কঠোর তপস্যা করেন। মুরারীর চরণচ্যুতা গঙ্গা শিবের জটার মধ্যে কিছুদিন ভ্রমিয়া ভগীরথের সহিত মর্ত্ত্যে আগমন করেন। ঐরাবতের দুর্ব্বুদ্ধি জন্মিলে তাহার লাঞ্ছনা হওয়ার কথাও চলিত আছে। কালিঘাটের কাছে একটি নদী রহিয়াছে তাহার অবস্থা বিলুপ্তির পথে চলিয়াছে। তাহার নাম আদিগঙ্গা।

কালীঘাটের পরে উহা বহু স্থানে শুকাইয়া গিয়াছে; নদীর শুষ্ক খাতে কেহ কেহ পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন; সেগুলিকে হালদারের গঙ্গা, ঘোষের গঙ্গা প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে। এই সকলের ভিতর কি সত্য যে লুকাইয়া আছে কে জানে—তবে মনে হয় ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারের কথায় হয়ত কিছু সত্য আছে। আবার যখন দেখি ভাগীরথী যেখানে বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিয়াছে সেই স্থানটিই গঙ্গাসাগর সঙ্গম—হিন্দুর পবিত্র মহাতীর্থ যাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি—

গঙ্গায়াঞ্চ জলে মোক্ষ বারাণস্যাং জলেস্থলে।
জলেস্থলেঅন্তরীক্ষেচ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে॥

তখন সব গুলাইয়া যায়। একটি মহাতীর্থ গড়িয়া উঠিতে বহুকালের আবশ্যক। মনটা সংশয়াকুল থাকিয়াই যায়।

আমাদের দেশে যে কয় লক্ষ বিঘা ক্ষেত্র বা জমি আছে তাহার সামান্য অংশই সেচের জল পায়, বেশীর ভাগ জমিই আকাশমুখী বা কৃষিজীবিদের ভাষায় দেবতামুখী। এই দেবতা শব্দটী দেব-দেবী অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; হইয়াছে মেঘ অর্থে। বৈষ্ণব কবিগণ শ্রাবণ মাস বর্ণনায় দেয়াগরজন বা দেব-গর্জ্জন মেঘগর্জ্জন অর্থে বহুসঃ ব্যবহার করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণেরও বহু পূর্ব্বে মেঘ অর্থে দেব শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। মহাকবি কালিদাসের কাল দেড় হইতে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে। কালিদাস তাঁহার মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে বকুলবালিকার মুখে সাধারণের ব্যবহার্য্য প্রাকৃত ভাষায় বলিয়াছেন, "দদ্দুরা বাহরন্তি ত্তি কিং দেবো পুহবিং বরিসিদুং বিরমোত্তি?"—দর্দ্দুরা বাহরন্তি ইতি কিং দেবঃ পৃথিবীং বার্ষিতুং বিরমোতি? ভেকেরা চীৎকার করে বলিয়া কি মেঘ পৃথিবীতে বারিবর্ষণে বিরত হয়? তাহা হইলে "দেবতামুখী" শব্দে বুঝিতেছি যে, সকল জমি বা ক্ষেত্র শস্য-উৎপাদনের প্রয়োজনীয় জলের জন্য মেঘ বা বৃষ্টির মুখাপেক্ষী।

এইস্থানে একটি কথা বলিবার ইচ্ছা দমন করিতে পারিতেছি না। বাংলার কৃষকগণ যে ভাষা ব্যবহার করিত তাহা প্রকৃতির সন্তান স্বভাব-কবিরই উপযুক্ত। তাহার জোর ও প্রকাশভঙ্গী

বিস্ময়কর; বড়ই দুঃখের বিষয় ঐ ভাষা বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। উৎসাহী তরুণ সাহিত্যামোদীগণের কেহ কেহ যদি ঐ ভাষাটিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহারা বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া যশস্বী হইবেন। একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আশ্বিন মাসের প্রথমে একজন কৃষিজীবীকে বলিলাম, "এ বৎসর সুচারু বর্ষণ হওয়ায় ধান জন্মিয়াছে ভাল; এ বৎসর বেশ কিছু পাইবে।" তাহাতে সেই ব্যক্তি আনন্দউচ্ছল মুখে বলিল, "দেবতা যদি আর দুটো মাস কীরষিণী করে তাহলে এ বছর চুটিয়ে ধান কাটব।" নূতন ভাষা শুনিয়া ঔৎসুক্য জন্মিল, ঐ কৃষাণ ও উপস্থিত দুই-একজন ব্যক্তির সাহায্যে বাক্যের অর্থ বুঝিলাম। কীরষিণী মানে কৃষাণের কাজ অর্থাৎ বর্দ্ধনশীল ধান্যগাছগুলির সুপুষ্ট পরিণতির জন্য আবশ্যকানুরূপ বৃষ্টি রৌদ্র প্রভৃতি সরবরাহ করা। কৃষকটির বলিবার উদ্দেশ্য যদি আশ্বিন ও কার্ত্তিক দুইমাস প্রাকৃতিক আবহাওয়ার অনুকূল হয় তবে প্রচুর ফসল হইবে। "চুটিয়া ধান কাটায়" একটি সহজ কবিত্বের বিস্ময়জনক প্রীতিকর অতিরঞ্জন বিকশিত হইয়াছে। ধান্যচ্ছেদন হয় কাস্তে দিয়া, তাহার আকার দ্বিতীয়ার চাঁদের ন্যায় বক্র। তাহার ধার কাটারী, খড়্গ প্রভৃতির ধারের ন্যায় সমতল নয় উহা ছোট করাতের ন্যায়; কৃষকের ভাষায় কাস্তের ধারকে চুড়িকাটা ধার বলে। ধান কাটিবার সময় কৃষক ডাইন হাতে কাস্তেটি ধরিয়া বাম হাতে

ধানগাছের গোড়াটি ধরিয়া কাস্তেয় টান দিয়া ধান কাটে। ঐ কাস্তের টানা-টানিকে কৃষকের ভাষায় কেঁচ বলে। "চুটিয়ে ধান কাটার" মানে ধানে ধানের খড়গুলি এরূপ মোটা ও শক্ত হইবে যে কাস্তের পেঁচ দিয়া না কাটিয়া কাটারীর চোট দিয়া কাটিতে হইবে। ধানের খড় এরূপ মোটা শক্ত কখনই হয় না। ইহা কৃষকের আশা সঞ্জাত অতিরঞ্জন হইলেও প্রকাশভঙ্গীটি খুব জোরাল। এরূপ ভাষার বিলুপ্তি আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ জমিই দেবতামুখী বা আকাশমুখী। সমগ্র জমির এক-দশমাংশও সেচের জল পায় কিনা সন্দেহ, নয়-দশমাংশ জমি বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। অনাবৃষ্টি হইলেই অজন্মা; আর দেশবাসীর অপরিসীম দারিদ্র্যের জন্য, তাহাদের তপ্ত খোলার অবস্থার জন্য অজন্মা হইলেই দুর্ভিক্ষ বা তদনুরূপ দুর্দ্দশা অনিবার্য্য। কাজেই বাংলাদেশের কৃষকগণ বহুশত বর্ষ ধরিয়া মেঘের গতি সুচারুরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছে এবং তাহাদের বহুপরীক্ষিত অভিজ্ঞতা দেশের মঙ্গলকল্পে ডাকপুরুষের বচনাকারে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের দেশে যে সকল ফসল উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে ধান্যই প্রধান। বাঙ্গালী অন্ন ভোজী, কাজেই ধান্যই প্রধান ফসল না হইয়া পারে না। বাংলা দেশে বহু প্রকার ধান্য উৎপন্ন হয়। সব ধানের পরিণতির সময় সমান সয়। চালি ধান্য চল্লিশ দিনে পরিপক্ক হয়; যাঠি যাঠ দিনে। আশু ও

কালো-আশু বা আশকেলেশ তিন মাসে। তাহার পর নেয়ালী বানেউলি, কার্ত্তিকী প্রভৃতি কার্ত্তিক মাসের মধ্যে বা অগ্রহায়ণের প্রথম দশ দিনের মধ্যে সংগৃহীত হয়। পশ্চিম-বঙ্গে উৎপন্ন ধানের বৃহৎ অংশটিকে হৈমন্তিক বা আমন ধান বলা হয়। ইহা সুপরিণত হইতে প্রায় ছয় মাস সময় লাগে; অগ্রহায়ণের শেষ সপ্তাহে আরম্ভ করিয়া পৌষের শেষ পর্য্যন্ত ইহা কর্ত্তিত হইয়া কৃষিজীবীদের খামারগত হয়। তাই পৌষমাস প্রাচুর্য্যের বা সৌভাগ্যের মাস। প্রবচনেও বলে, "কারো পৌষমাস, কারো সর্ব্বনাশ" এখনও পৌষ মাসের শেষ রাত্রিতে পল্লীরমণীগণের শীতকম্পিত কণ্ঠে "এসো পৌষ যেও না জন্ম জন্ম ছেড়ো না" প্রভৃতি মধুর পৌষ-আহ্বান পল্লীরজনীকে মুখরিত করে। ইহাকে পৌষ ডাকা বলে। সব দেশের সংসারী জীব সৌভাগ্য ও প্রাচুর্য্যেরই প্রার্থী। সন্ন্যাসীপ্রবর শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সংসার বিরাগী শিষ্যগণের সংসারমোহ চূর্ণ করিবার জন্য মুদ্‌গর রচনা করিলেও তাহা সংসারী জীবের বেশ ধাতুসহ হয় না; "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং" প্রভৃতি উপদেশ মনের বাহির দরজার বাহিরেই পড়িয়া থাকে। সংসারী জীবের মন অর্গলা-স্তোত্রের

অচিন্ত্যরূপ চরিতে সর্ব্ব শত্রু বিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি॥

প্রভৃতি স্তোত্রে বেশ সাড়া দেয়, আর সারা দেয় ঐ

অর্গলাস্তোত্রেরই বঙ্গপল্লী সংস্করণ ঐ পৌষ ডাকায় বা সৌভাগ্য-সম্পদ আহ্বানে।

পশ্চিম বাংলার প্রধান ফসল হৈমন্তিক ধান্য পৌষ মাসের মধ্যেই কর্ষিত ও সংগৃহীত হয়। এক হিসাবে পৌষ মাসই এদেশের ফসলী বৎসরের শেষ মাস। সেই জন্যই পৌষ মাস হইতেই আগামী বৎসরের আবহাওয়ার উপর সুচিন্তিত দৃষ্টিদান পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমে পৌষ মাসই মাসশোধা নির্ণয়ের ব্যবস্থা। 'মাস শোধা' কথাটা পল্লীবাসী মাত্রেরই খুব পরিচিত; তবে দুঃখের বিষয় না-বুঝা রাজনৈতিক হৈ-চৈতে মাতিয়া এই জিনিসটা যে কি তাহা ভালরূপে বুঝিবার অনেকেরই অবসর হয় না। কথাটির কিছু বিস্তৃতভাবে আলোচনা আবশ্যক মনে করি। মাস শোধা অনুসারে পৌষ মাসের দিনগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আগামী বৎসরে কোন মাসের কোন সময়ে বৃষ্টি হইবে কোন সময়ে হইবে না তাহা নির্ণয় করা হইত।

আমাদের দেশের প্রায় সকলেই রাশিচক্রের কথা জানে। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তূলা, বিছা, ধনু, মকর। কুম্ভ ও মীন এই দ্বাদশ রাশির প্রত্যেকটিতে সূর্য্য এক এক মাসপর্য্যায়ক্রমে অবস্থিতি করে। সাধারণ ভাষায় আমরা বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আর্ষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র এই বারটি মাসে একটি বৎসর পূর্ণ হইল ধরিয়া মাসগুলির উল্লেখ করি। দৈব বা পৈত্র কার্য্যে

বা পূজা শান্তি স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যে পুরোহিতগণ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি নাম উল্লেখ না করিয়া "মেষ রাশিস্থে ভাস্করে" "বৃষরাশিস্থে ভাস্করে" প্রভৃতি উল্লেখ করেন। ডাক পুরুষও অনেক সময়েই রাশি উল্লেখই মাস উল্লেখই মাস উল্লেখ করিয়াছেন। মাস শোধায় ডাকের বচনটি এই :—

আগে পিছে ধনু শোধে, মীন অবধি তূলো।
মকর, কুম্ভ, বিছা শোধে মাস ফুরিয়ে গেলো॥

ধনু—পৌষ	আগের দফায়	১।০	সওয়া দিন
মীন—চৈত্র	তাহার সম্যক অংশ	২॥০	দিন
মেষ—বৈশাখ	” ” ”	২॥০	”
বৃষ—জ্যৈষ্ঠ	” ” ”	২॥০	”
মিথুন—আষাঢ়	” ” ”	২॥০	”
কর্কট—শ্রাবণ	” ” ”	২॥০	”
সিংহ—ভাদ্র	” ” ”	২॥০	”
কন্যা—আশ্বিন	” ” ”	২॥০	”
তূলা—কার্ত্তিক	” ” “	২॥০	”
মকর—মাঘ	” ” ”	২॥০	”
কুম্ভ—ফাল্গুন	” ” ”	২॥০	”
বিছা—অগ্রহায়ণ	” ” ”	২॥০	”

ধনু বা পৌষের পিছের অংশ কয়দিনে পৌষ মাস হয় তাহার উপর নির্ভর করে। ১১ মাসের প্রত্যেকের ২॥০ দিন ধরিয়া হয় ২৭॥০ দিন। তাহাতে পৌষের আগের অংশের

১।০ দিন যোগ করিলে হয় ২৮৷৵০ দিন। যদি পৌষ মাস ২৯ দিন হয়, তাহা হইলে পৌষের পিছের অংশ হয় ।০ দিন অর্থাৎ পৌষের আগে পিছে ধরিয়া তাহার অংশে পড়ে মোট ১১॥০ দিন। যদি পৌষমাস ৩০ দিনে হয় তাহা হইলে পৌষের পিছের অংশও ১।০ দিন হয় এবং মোটের উপর অন্য মাসগুলির মত তাহারও অংশে ২॥০ দিন পড়ে। আগামী বর্ষের যে মাসের সহিত এ বৎসরের পৌষ মাসের যে দিনগুলির সংশ্রব তাহার আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আগামী বৎসরের কোন মাসে বৃষ্টি হইবে না স্থির করা হয়, যথা :—পৌষ মাসের ১১।০ দিন পরে শ্রাবণ মাসের সময় পড়িলে ১১।০+২॥০=১৩৷৵০ পর্য্যন্ত শ্রাবণের অধিকার। ডাকের বচন, "বায়ে বর্ষণ, মেঘে আত্তশা"—পৌষ মাসে মাঝে মাঝে জোরে বায়ু বহে, মাঝে মাঝে মেঘ দেখা দেয়। পৌষের ১১।০ দিনের পর যদি ২॥০ দিন জোরে বায়ু বহে, তাহা হইলে শ্রাবণে বর্ষণ হইবে, আর যদি আকাশে মেঘ দেখা দেয় তাহা হইলে আত্তশা অর্থাৎ বর্ষণাভাব হইবে। ঐ ২॥০ দিনের সব সময়টাই জোর বায়ু বা মেঘ হয় না; হয়ত প্রথম দিনের কিছু সময় বায়ু বহে কিছু সময় আকাশে মেঘ থাকে। ২॥০ দিনের যে অংশে বায়ু প্রবল থাকে সেই অংশে বর্ষণ এবং যে অংশে মেঘ থাকে সে অংশে অবর্ষণ আর যে অংশে মেঘ বা বায়ু থাকে না সে অংশে স্বাভাবিক আবহাওয়া হইবে—ইহাই ধরিয়া লওয়া হয়। পৌষ শোধা আবহাওয়া লক্ষ্য করিয়া প্রবীণ ব্যক্তিগণ

কিরূপ কি হইল ও হইবে তাহা লিখিয়া রাখিতেন। প্রায়ই দেখা গিয়াছে ঐ ভাবে যে ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা হইত তাহা বহু ক্ষেত্রেই সত্য হইত।

পৌষ মাসের পর মাঘ মাস। ঐ মাস সম্বন্ধে বহু ডাকের বচন আছে। একটি হইতেছে, "মাঘের মাটি হীরার পাটি", আর একটি, "ধন্য রাজা পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ।" কৃষি-পণ্ডিতগণ বলেন যে, জমি হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়াই ফসল উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদগণ জমির যে অংশ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় তাহা যবক্ষারজান প্রভৃতি কয়টি বস্তু। ফসলে জমির যে অংশ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে সেই অপচয় সার দিয়া পূরণ না করিলে জমির উর্ব্বরতা থাকে না; সেইজন্য নানা জাতীয় সার প্রয়োগ করিয়া উর্ব্বরতা রক্ষার ব্যবস্থা বহু পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে। গোময় সার, পাতাপচা সার, ধন্‌চে শন প্রভৃতি চারাগাছ পচাইয়া সার, রেড়ী বা সরিষার খোল, পুরাতন পুকুরের পাঁক প্রভৃতি বহুবিধ সার বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষির বহু উন্নতি সাধিত হওয়ায় এখন বহুবিধ বৈজ্ঞানিক সারও প্রচলিত হইতেছে। বহু প্রাণীজ সার যাহা পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত না তাহাও এখন ব্যবহৃত হইতেছে। যেমন হাড়চূর্ণ, নাগরিক কম্পোষ্ট প্রভৃতি।

আমাদের দেশের কৃষকগণ দরিদ্র। জমিতে আবশ্যকমত

সার দিবার অর্থ-সামর্থ্য তাহাদের নাই। তাহার উপর তাহাদের গোকলি হইতে যে গোবর হয় তাহার কতকাংশ ঘুঁটে তৈয়ারি করিয়া জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়। বায়ুস্তরে যে অফুরন্ত যবক্ষারজান আছে তাহা জমিতে লাগাইতে পারিলে জমিতে সার দেওয়ার কাজ হয়। বায়ুস্তরের ক্ষারজান জমিতে লাগাইতে হইলে জমির মুখ খুলিয়া দিতে হয়। ধানের জমি কয়েক মাস জলে ডুবিয়া থাকিয়া মাটির উপরিভাগে একটি কঠিন পদার্থ জমিয়া যায়। ঐ পর্দ্দা লাঙ্গল দিয়া ভাঙ্গিয়া না দিলে জমির মুখ খুলিয়া দেওয়া হয় না এবং মাটি বায়ুস্তরের ক্ষারজান ধরিয়া লইতে পারে না। মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলে জমির মুখ খুলিয়া দিলে জমিতে ভালরূপে সার দেওয়ার কাজ হয়। সেইজন্য মাঘে বর্ষণ কৃষিজীবিদের বাঞ্ছনীয়। কৃষকগণ প্রথমে বীজতলায় চাষ দিতে আরম্ভ করে, কারণ বীজতলা উর্ব্বরা হইলে চারা ভাল হয়।

ছাত্রগণের অধ্যয়ন যেমন তপস্যা, কৃষকগণের কৃষিকার্য্যও তেমনি তপস্যা। তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে চাই চিন্তাস্বাধীনতা ও কর্ম্মস্বাধীনতা। ঐ দুই স্বাধীনতায় বাধা দান করিলে, ঈশ্বরের নিয়মের বিরুদ্ধাচারণ করা হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'স্বকর্ম্ম ফলভাক্ পুমান' ; মানুষকে যদি নিজ কর্ম্ম-ফল ভোগ করিতে হয় তাহা হইলে তাহার কর্ম্মস্বাধীনতা থাকা চাই, না থাকিলে যে সব ওলট-পালট হইয়া যায়।

দার্শনিক বলিয়াছেন, "সর্ব্বং আত্মবশং সুখম্। সর্ব্বং পরবশং দুঃখং"। ঐ ভাব প্রকাশক বহু ডাকের কথা আছে। এখানে কয়টির উল্লেখ করিলাম ঃ—

১। পরের বুদ্ধিতে মরি, আপনার বুদ্ধিতে তরি।

২। ঝাল খেলে পরের মুখে,
চিরকালই কাটবে দুঃখে।

৩। যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।

৪। বাপে পোয়ে করলে চাষ, হবে তাতে দুঃখের নাশ।
পর মজুরে করলে ভর, দুখ্খু বাড়বে পর পর।

৫। খাটে খাটায় দু'গুণ পায়, তার অর্দ্ধেক ছাতি মাথায়।
ঘরে বসে পুছে বাত, এ বছর যেমন তেমন,
আর বচ্ছর হা ভাত।

এইস্থানে ব্যাখ্যামুলক কিছু না বলিলে কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারীগণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি অনেক পাঠকই তাহার উল্টা অর্থ গ্রহণ করিবেন বলিয়াই আশঙ্কা হয়। ঈতি সম্বন্ধীয় শ্লোকটির অর্থ করিবার সময় বলিয়াছি রাজপুরুষগণের সান্নিধ্য কৃষির একটি ঈতি। ঐ শ্লোকটি বহু শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত, এখনকার অবস্থায় উহা প্রযোজ্য নয়। সরকারী লোক পল্লীগ্রামে যাইলে ফল ভাল হয় না বলিয়াছি; কিন্তু উহা সকল কর্ম্মচারীর পক্ষে প্রযোজ্য নয়। সরকারী অন্য

সকল বিভাগের ন্যায় কৃষিবিভাগেও দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর মানসিকতায় চাকরী ও পদগৌরবই মুখ্য এবং কর্ত্তব্য গৌণ। ইহাদের সম্বন্ধেই ঐ সকল কথা কিছু কিছু খাটে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানসিকতায় কর্ত্তব্যই মুখ্য এবং চাকরী ও পদগৌরব গৌণ। এই শ্রেণীর কর্ম্মচারী-গণ কৃষি বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত, হৃদয়বান, মননশীল ও পরচিত্তজ্ঞ; ইহারা দরিদ্র, নিরক্ষর, অসহায় কৃষকগণকে ভাই-এর ন্যায় ভালবাসেন এবং তাহাদের মঙ্গল চিন্তা করেন। চরিত্রগুণে তাঁহারা পল্লীবাসীদের প্রীতি, শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাজন হন। এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের সান্নিধ্য শুধু প্রীতিকরই নয়, তাহা বিশেষ বাঞ্ছিতও। আমাদের দেশে কৃষি এখনও শৈশবাবস্থায়; ঐ কর্ম্মচারীগণের সুনিপুণ কর্ম্মিত্বে উহা পরিণত যৌবন লাভ করিবে। তাঁহারাই ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, জার্ম্মেণী প্রভৃতি উন্নত-কৃষি দেশগুলির সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া, দেশকালপাত্রেরই উপর লক্ষ্য রাখিয়া এদেশে সামান্য যাহা কিছু আছে তাহার ভিত্তি পোক্ত করিয়া সেগুলি বজায় রাখিয়া কৃষির উন্নতিকল্পে সুবিবেচিত নিপুণতার সহিত আবশ্যক নূতনত্বের প্রচলন করিবেন; ট্রাকটর, নিড়ান, বীজ বপন, শস্য নিষ্কাষণ প্রভৃতি বহুবিধ যন্ত্রের আবশ্যকানুরূপ চলন বাড়াইবেন। তাঁহারাই কৃষিজীবীদের বাস্তুভিটায় সজিনা, পেঁপে, পেয়ারা, কাগজিলেবু প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণের এবং ছাগ মেষ, শ্বেতশশক, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষী

পালনের শিক্ষা দিবেন। আবার যখন ঐ প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণও মনোন্নয়নের দ্বারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সহিত এক মনোভাব হইবেন অর্থাৎ যখন সকলেই সরলভাবে কৃষির উন্নতিকামী হইবেন তখন কৃষির প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে।

তবে তখনও হৃদয়বান দেশনেতাদের কাম্য সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাহা করিতে হইলে কৃষিজীবিগণকে আগাইয়া আসিতে হইবে, তাহাদের চরিত্র পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। দেশবাসীর দোষই উন্নতির বাধক। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী-চরিত্র অঙ্কিত করিতে লিখিয়াছিলেন—

অগাধ আলস্যে বসি ঘরের কোণে ভায়ে ভায়ে করি রণ,
আপনার জনে ব্যথা দিতে মনে তার বেলা প্রাণ পণ।
আপনার দোষে পরে করি দোষী
আনন্দে সবার গায়ে ছড়াই মসী,
হেথা—আপন কলঙ্ক উঠিছে উছসি
রাখিবার নাহি স্থান;
আপনারে শুধু বড় বলে জানি,
করি হাসাহাসি, করি কানাকানি,
কোটরে রাজত্ব ছোট প্রাণী
ধরা করি সরা জ্ঞান।

মনে হয় এখনও ঐ চরিত্রই বর্ত্তমান। উহা ত্যাগ করিয়া উন্নতিকামী হইতে হইবে। মনে উন্নতির ভাবনা উদ্বুদ্ধ হইলে

ভগবান সহায় হইবেন—উন্নতি আসিবে ; মনীষী বাক্য, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" মিথ্যা নয়। শুধু মনের মধ্যে উন্নতি কামনা পোষণ করিলেই চলিবেনা ; কাজ করিতে হইবে, হইতে হইবে অনলস, শ্রমশীল, কলহত্যাগী ও পরস্পরের প্রতি প্রীতি-ভাবাপন্ন। আর হইতে হইবে সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা-পূর্ণ ও তাহার সহিত সহযোগিতাসম্পন্ন। এইভাবে উভয় পক্ষের দোষ স্খালন হইলেই দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সুনিশ্চিত হইবে এবং ভারতীয় আর্য্যগণের জাগরণ স্বপ্নের জাগরণ না হইয়া হইবে সত্যিকারের জাগরণ।

হিন্দু ও হিন্দুস্থান

মানবজীবনের আদি প্রশ্ন—এই জীবনটা লইয়া কি করিব? কোন পথ ধরিয়া চলিলে এই মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়? পশুপক্ষীর ন্যায় আহার, নিদ্রা, সন্তান-উৎপাদন, দ্বন্দ্ব-কলহ প্রভৃতি লইয়া জীবন যাপন করিয়া চলিতে বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সম্মত নয়। বহু চিন্তা, বহু যুক্তি-তর্ক বহু ভূয়োদর্শনের দ্বারা সর্ব্বদেশের অতীত মনীষিগণ স্থির করিলেন যে পশুপক্ষী ও মানুষের মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি; মানুষের অন্তর-বৃত্তি সমূহের মধ্যে বুদ্ধি, স্মৃতি, যুক্তি, প্রীতি, চিন্তা প্রভৃতির প্রাখর্য্য মনুষ্যেতর জীবে পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহারা আরও লক্ষ্য করিলেন মানুষের আত্মা বলিয়া একটি বস্তু আছে যাহা অন্য জীবে আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ বর্ত্তমান। তাঁহারা আরও স্থির করিলেন ঐ আত্মা অবিনাশী; শরীরের বিনাশে বা মৃত্যুর সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয় না; কাপড় ছিঁড়িয়া যাইলে যেমন মানুষের দেহটাও ছিঁড়িয়া যায় না, সেইরূপ দেহের নাশে আত্মার নাশ হয় না। তখন আত্মার বিষয়ে জানিবার ইচ্ছা বৃদ্ধি পায় প্রশ্ন ওঠে, আত্মা কোথায় থাকে, কি ভাবে থাকে। বহুতত্ত্ব আবিষ্কৃত ও আলোচিত হয়। মোটামুটি স্থিয় হয় মামবাত্মা বা জীবাত্মা বিশ্বাত্মারই অংশ, বিশ্বাত্মা এই বিশ্বে যে ভাবে আছেন মানবাত্মাও মানবদেহে সেই ভাবেই

আছেন। ঐ বিষয় আলোচনার স্থান এখানে নয়। শাস্ত্রে বিশ্বাত্মা সম্বন্ধে "ভূতভৃণ ন চ ভূতস্থ" কথা আছে, উহার অর্থ তিনি ভূতগ্রামকে ভরণ করিতেছেন, তবে তিনি ভূতের মধ্যে নাই। বিমল-জ্ঞান ঋষি ও মনীষিগণের ঐ বিষয়ক চিন্তা-প্রণালীর সহিত পরিচিত না হইলে ঐ কথাগুলিকে হেঁয়ালী বলিয়াই মনে হইবে। বিশ্বাত্মা বিশ্বের সর্ব্বত্র অনু পরমানুতে পরিব্যাপ্ত। প্রশ্ন ওঠে ঐ ভগবানের কার্য্য কি, শক্তি কি, রূপ কি ?

আত্মা ও বিশ্বাত্মা, জীব ও ব্রহ্ম—এক কথায় বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে ঐ সকল বিবিধ প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করিতে গিয়া বিভিন্ন দেশের মানব বিভিন্ন মত প্রচার করিয়াছে এবং তাহাতে মানব সমাজে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের উৎপত্তি হইয়াছে। হিন্দু, জরথুষ্ট্রীয়ান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি বহু ভিন্ন ধর্ম্মসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। জরথুষ্ট্রীয়ান ধর্ম্মসমাজ (বোম্বাই প্রদেশের অগ্নি-উপাসক পার্শীগণ এই সম্প্রদায় ভুক্ত) জরথুষ্ট্রকে ঋষি এবং জেন্দ্ আবেস্তাকে আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন; বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবকে মহামানব এবং জাতক ত্রিপিটক প্রভৃতিকে আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ থাকেন; খ্রীষ্টানগণ যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র ও মানবের ত্রাণকর্ত্তা এবং বাইবেলকে আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করেন; মুসলমানগণ হজরৎ মহম্মদকে মানব মঙ্গলের জন্য প্রেরিত ঈশ্বরের বন্ধু এবং কোরাণ শরীফ্কে আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করেন; হিন্দুগণ

ভগবানের বহু অবতার স্বীকার করেন এবং ঋষিগণ যে অপ্রমেয় জ্ঞানী ও ত্রিকালজ্ঞ এ-কথাও স্বীকার করেন। বেদ হিন্দুর আপ্তবাক্য এবং তাহা অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত। জগতে বর্ত্তমানে যতগুলি ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে হিন্দুধর্ম্মই সে সকলের মধ্যে সর্ব্বপুরাতন। বহু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া বহু জ্ঞানী, ভক্ত ও ব্রহ্মবিদের মধ্যে যে সত্যের আলোক বিকশিত হইয়াছে তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের বহু মত, বহু পথের উদ্ভব হইয়াছে। হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থও বহু—স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন, তন্ত্র প্রভৃতি। ইউরোপ প্রভৃতি ভিন্ন দেশবাসী ভিন্ন-ধর্ম্মী পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ সেজন্য হিন্দুসমাজকে বৈচিত্র্যপূর্ণ বলেন। কেহ কেহ এমনও বলেন যে ভারতবর্ষে জগতের প্রায় সর্ব্বধর্ম্মমতই রহিয়াছে; কাজেই যাহাকে হিন্দু-ধর্ম্ম বলা হয় তাহা বহু ধর্ম্মমতের একত্র সমাবেশ; তবে তাহা মিলিত বা মিশ্রিত হইয়া এক ধর্ম্মে পরিণত হয় নাই। ঐ কথা একদেশদর্শিতা বা অজ্ঞতা-প্রসূত বলিয়াই মনে হয়। হিন্দুধর্ম্মে ভিন্ন মত ও ভিন্ন পথ থাকিলেও তাহাতে যে একটি বিশেষ ঐক্য অনুস্যূত রহিয়াছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন। বহু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতও স্বীকার করেন যে, হিন্দুধর্ম্মে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বিশেষরূপেই লক্ষ্যণীয়। অভিনিবেশ সহকারে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় ঐ সকল ভিন্ন মত ও পথ প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মমত নয়, সেগুলি হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত সিদ্ধ সাধকগণের অপরোক্ষ অনুভূতিলব্ধ সাধনমার্গ বা পন্থা মাত্র।

হিন্দুর কাছে বেদ অভ্রান্ত। যে সকল মত বেদের অভ্রান্ততা স্বীকার করিয়া উদ্ভূত তাহা হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্গত পরীক্ষালব্ধ সাধন প্রণালীমাত্র; হিন্দুর কয়টি বৈশিষ্ট্য আছেঃ (১) আত্মার অবিনাশিত্বে (২) জন্মান্তরবাদে ও (৩) কর্ম্মবাদে বিশ্বাস। অন্য ধর্ম্মসমূহে আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস আছে কিন্তু জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে স্পষ্ট স্বীকৃতি নাই। জগতে কেন একজন সুরূপ অন্যজন কুরূপ, একজন নীরোগ অন্যজন রুগ্ন, একজন মেধাবী অন্যজন জড় বুদ্ধি, একজন সুখী অন্যজন দুঃখী, একজন সাহসী অন্যজন ভীরু—এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসহীন অন্য ধর্ম্মে থাকিলেও তাহা যুক্তি ও বিবেকসম্মত নহে। হিন্দুধর্ম্মে ঐ বৈচিত্র্যের সমাধান জন্মান্তরবাদে ও কর্ম্মবাদে। কাজেই এ কথা প্রতিবাদের আশঙ্কা না করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, যে ধর্ম্মমত আত্মার অবিনশ্বরত্বে, জন্মান্তরবাদে ও কর্ম্মবাদে বিশ্বাসী তাহাই হিন্দুধর্ম্ম।

প্রশ্ন ওঠে 'হিন্দু' শব্দটি কোথা হইতে আসিল? বেদাদি শাস্ত্রে 'হিন্দু' বলিয়া কোন শব্দ নাই, আছে ধর্ম্ম, মানবধর্ম্ম, বৈদিকধর্ম্ম, ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম, আর আছে সপ্ত সিন্ধু ভূভাগের কথা। ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে পারস্যদেশে দরায়ুঃ নামে একজন রাজা ছিলেন। রাজ্য জয়ে তিনি বাহির হইয়া সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত বহুদেশ জয় করেন। সেই সময়ে ভারতীয় আর্য্যগণের দেশ

সোমপর্ব্বত (যাহাকে এখন হিন্দুকুশ বলা হয়) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; দুর্য্যোধন জননী গান্ধারীর পিতৃভূমি গান্ধার (বর্ত্তমান কান্দাহার) এবং আফ্গানিস্থানের আরও বহু অংশ ভারতীয় আর্য্যগণের বাসভূমি ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে ইহা আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা ; তখন মুসলমান ধর্ম্মের বা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উদ্ভব হয় নাই এবং বৌদ্ধধর্ম্মও বহুদেশে বিস্তার লাভ করে নাই ; তখন বেদের কর্ম্মকাণ্ডে উল্লিখিত যজ্ঞ ও স্তবাদির অনুরূপ ধর্ম্মাচরণ প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল। কাজেই তখন ধর্ম্মের নামে দেশের নামোল্লেখ সম্ভবপর ছিল না। বিজয়ী ও বিজিতের ধর্ম্মের এরূপ কোন পার্থক্য ছিল না যাহাতে বিজিত বিধর্ম্মীর নিকট পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করে বা বিজয়ীর মধ্যে বিজিতদিগকে ধর্ম্মান্তরিত করনের হীন প্রচেষ্টা দেখা দেয়।

এই দরায়ুঃ যে সকল স্থান জয় করিয়া নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন তাহার মধ্যে ছিল সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী প্রদেশ যাহা বেদাদিতে সপ্তসিন্ধু দেশ বলিয়া উল্লিখিত হইত এবং তদ্দেশবাসীগণ কেহ কেহ সিন্ধুস্থানও বলিত। পারসীকগণ 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারণ করিত; কাজেই সপ্তাহ হইল হপ্তা, সিন্ধু হইল হিন্দু। তাহার পর ভারতীয় আর্য্যগণ গ্রীক বা যোন বা যবনগণের সংস্পর্শে আসিলেন। বোধ হয় যবনগণ বহুপূর্ব্বেই ভারতীয় আর্য্যগণের সংস্পর্শে আসিয়া-

ছিলেন ; মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় জতুগৃহদাহের ষড়যন্ত্রের কথা বিদুর পূর্ব্বেই যাবনিক ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে জানাইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ যবনরাও সি স্থানে হি বা ই উচ্চারণ করিতেন ; সিন্ধু হইয়াছিল হিন্দু এবং হিন্দুকুশ হইয়াছিল হিন্দোকো বা ইন্দোকো। অনেকের মতে হিন্দু শব্দের এরূপেই উৎপত্তি। বাক্ বা শব্দের উৎপত্তি যেরূপেই হউক তাহার একটা অর্থ একটা সংজ্ঞা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। এখানেও হইয়াছে তাহাই। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য কোন কোন বিধর্ম্মীর মতে হিন্দু শব্দ গ্লানিকর অপবাদ বা গালিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইহা যে হীনতা ব্যঞ্জক মিথ্যা, ইতিহাস পাঠ করিলেই তাহা অনুভূত হয়। সে সময়ের হিন্দুগণ শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও জ্ঞানে বিদেশীদের শ্রদ্ধাই আকর্ষণ করিতেন। যদি তাঁহারা হিন্দু শব্দ গ্লানি বা অবমাননাজনক মনে করিতেন তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই ঘৃণাভরে পরিত্যক্ত হইত। তাহা হয় নাই ; বরং পরবর্ত্তী তন্ত্রাদিতে হিন্দু শব্দে যে অর্থারোপ করা হইয়াছে তাহা মহত্ত্ব ও গৌরব ব্যঞ্জক। মেরুতন্ত্রে পাওয়া যায় ঃ—

হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিতি উচ্যতে,

অর্থাৎ যিনি সমস্ত হীনতাকে দূর করিয়াছেন তিনিই হিন্দু।

ঐ হিন্দুগণের বাসভূমি বা হিন্দুস্থান কোন স্থান ? এ প্রশ্নের উত্তর স্থির করিবার বহুপথ পূর্ব্বতন মনীষিগণ আঁকিয়া গিয়াছেন। প্রথম ঃ—পৌরাণিক কথা এবং তদনুসারী পীঠস্থান-

সমূহ। পুরাণে ইতিহাসের উক্তি অনুযায়ী দক্ষ প্রজাপতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত শিবহীন যজ্ঞে তদীয় কন্যা সতী বিনা নিমন্ত্রণে আগমন করিলে, দক্ষ তাঁহার নিকট পতিনিন্দা করায় তিনি দেহত্যাগ করেন; শোকবিহ্বল শিব সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতে শুরু করিলে জগৎ কার্য্য লুপ্ত হইবার আশঙ্কায় বিষ্ণু তাঁহার চক্রের দ্বারা সতীঅঙ্গ বাহান্ন অংশে বিভক্ত করেন। সতীঅঙ্গের অংশ সকল যে যে স্থানে পতিত হয় সেখানে এক একটি পীঠস্থান বা মহাতীর্থস্থান উদ্ভূত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, দূর দূরান্তরে স্থাপিত হইলেও পীঠস্থানগুলিতে একটি বিশেষ ঐক্য আছে; প্রত্যেক পীঠস্থানেই দেবী ও ভৈরব আছেন; তবে কোন পীঠ দেবী-প্রধান, কোন পীঠ ভৈরবপ্রধান। কেবলমাত্র কাশীধামে দেবী ও ভৈরব তুল্যরূপে প্রধান; সেজন্য কাশীকে অন্নপূর্ণার নগর বা বিশ্বেশ্বরের নগর দুই বলা চলে। ঐ পৌরাণিক কথার কেহ কেহ রূপক অর্থ করেন। ঐ কথা ইতিহাসই হউক বা রূপকই হউক তাহা লইয়া আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নাই; তবে আমরা দেখিতে পাইতেছি ঐ বাহান্নটি পীঠস্থান আজও ভারতমাতার সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত; বেলুচিস্থান, সৌরাষ্ট্র কাশ্মীর, নেপাল, আসাম, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, কলিকাতা, শ্রীক্ষেত্র, কাবেরীতীর, লঙ্কাদ্বীপ, প্রভৃতি সর্ব্বত্রই পীঠস্থান আছে। যাঁহারা এ বিষয়ে সবিশেষ জানিতে চাহেন তাঁহারা পীঠস্থান মাহাত্ম্য পাঠ করিলেই সব জানিতে পারিবেন।

ডিরেক্টরী পঞ্জিকাগুলিতেও পীঠস্থানগুলির উল্লেখ আছে। ইহা হইতে পাই বেলুচিস্থান ও লঙ্কাদ্বীপ সহ সমগ্র ভারতভূমি হিন্দুস্থান।

দ্বিতীয়ঃ—দৈব বা পৈত্র কার্য্য করিতে বসিয়া জলশুদ্ধি করিবার জন্য এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়ঃ—

গঙ্গে চ যমূনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিংকুরু॥

অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী নদীগুলি যে দেশে প্রবাহিত হয় সেইদেশ হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষ।

হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ রক্ষার জন্য নিয়োজিত-সর্ব্বস্ব, অদ্ভুতকর্ম্মা স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম প্রীতির অপরাধে আন্দামান দ্বীপে রাজদণ্ডভোগকালে দৈব প্রভাবে যে মন্ত্রটী লাভ করেন তাহাতে হিন্দু ও হিন্দুস্থান সম্বন্ধে একটী সুস্পষ্ট সংজ্ঞা বিকশিত হইয়াছে। মন্ত্রটী এইঃ—

অসিন্ধু সিন্ধু পর্য্যন্ত যস্য ভারতভূমিকা।
পিতৃভূঃ পুণ্যভূশ্চৈব সর্বৈ হিন্দুরিতিস্মৃতঃ॥

সিন্ধুনদ হইতে পূর্ব্বে ও দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত ভারত ভূমি যাহার পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি তিনিই হিন্দু। এই সংজ্ঞানুসারে বৌদ্ধ, জৈন, কবীরপন্থী, দাদুপন্থী প্রভৃতি সকলেই হিন্দু। মুসলমান ও পার্শীগণের ভারতভূমি পিতৃভূমি হইলেও তাহারা ভারতকে পুণ্যভূমি বলিয়া স্বীকার করে না বলিয়া তাহারা হিন্দু নহে।

এখন বোধ হয় হিন্দু ও হিন্দুর বাসভূমি সম্বন্ধে কিছু জানিলাম। হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপে অজ্ঞতাজনিত আবর্জ্জনায় মলিন হইয়াছে এবং সেই মলিনতা দূর করিয়া কিভাবে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজকে তাহার গৌরবোজ্জ্বল উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করিতে পারা যাইতে পারে সেই বিষয়ে প্রত্যেক হিন্দুর অনুশীলন করা কর্ত্তব্য।

দুর্গোৎসব প্রসঙ্গে

যখন হইতে ভারতবাসী বিদেশীর শাসনাধীনতায় তাহদের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ রূপ সর্ব্ববিধ জীবন ব্যাপারেই নানা-প্রকার অমঙ্গল প্রকাশ পাইতে দেখিল তখনই তাহারা বিদেশী শাসন-পাশ হইতে মুক্তি লাভের বা স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টিত হইল। তাহাদের প্রয়াস বাক্যে ও কার্য্যে প্রকাশ পাইল। যে প্রচেষ্টাকে উদ্ধত আত্মম্ভরী বিদেশী শাসকগণ মিথ্যার আশ্রয়ে সিপাহী-বিদ্রোহ নাম দিয়া ঘৃণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে—সত্যদ্রষ্টা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তাহাই ভারতবাসীর প্রথম স্বাধীনতা সমর। তাহার পর সঙ্ঘশক্তি জাগাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও শেষে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা। এই সব প্রচেষ্টাতে বাঙ্গালীই অগ্রণী। সাম্রাজ্য মোহমুগ্ধ, স্বার্থান্ধ ইংরাজ ভারতবাসীর ঐ সব প্রচেষ্টাকে অনুকূল দৃষ্টিতে দেখিতে পারিল না। বাঙ্গালী ও বাংলা দেশের উপরই তাহার বিষ-দৃষ্টি পুর্ণরূপে পতিত হইল। তাহাদের প্রতিকূলতা কুটিল রাজনীতির অনুসরণ করিয়া সম-দম-ভেদনীতির সহায়তায় ভারতকে বিশেষতঃ বাংলাদেশকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া দিল। নানাবিধ অমঙ্গলকর আইন প্রণয়ণ দ্বারা কৃষির অবনতি ঘটাইল, শিল্প বাণিজ্যের প্রসার বন্ধ করিল, শিক্ষাপ্রবাহ বিপথে চালিত করিল, অস্বাস্থ্যের প্রতিরোধে উদাসীন হইল

এবং বিভিন্ন ধর্ম্মমতের অস্তিত্বের সুযোগ লইয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়া জল সিঞ্চনদ্বারা তাহা বিষবৃক্ষে পরিণত করিল। কতকগুলি নীচপ্রকৃতি ভারতবাসী হীনতা ও বিদ্বেষবিজড়িত স্বার্থের বশে বিভ্রান্ত বুদ্ধিতে ইংরাজের ঐ কৌটিল্য নীতির সহায়তা করিয়া চলিল। তাহাতে সারা ভারত বিশেষতঃ বাংলা দেশ আজ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে।

কুটিল নীতির অনুসরণে গত কয় বৎসর ধরিয়া যাহাদের উপর দেশ শাসনের ভার অর্পিত হইয়াছিল তাহাদের বিকৃত বুদ্ধিপ্রসূত অবিবেচনায়, অদূরদর্শিতায়, একদেশদর্শিতায় ও উচ্ছৃঙ্খলতায় বাঙ্গালী আজ নিরানন্দ নরকের জীবে পরিণত হইয়াছে; অভাব রাক্ষসী তাহার অস্থি চর্ম্ম মেধ মজ্জা চর্ব্বণ করিতেছে। সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা অতি সুন্দরী জগদ্ধাত্রীরূপিণী বঙ্গজননী আজ করালী কালী মূর্ত্তিতে পরিণতা; তাই তিনি আজ শুষ্ক মাংসাতিভৈরবা, নরমালা-বিভূষণা নিমগ্নরক্ত-নয়না, নাদাপূরিতদিঙ্মুখা। আজ তাই বাংলা মায়ের দুর্ভাগ্য সন্তান আমাদের ক্ষুধা নিবারণের অন্ন নাই, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নাই, রোগে ঔষধ পথ্য নাই, শীততাপ হইতে আত্মরক্ষার জন্য একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিবার উপকরণ পর্য্যন্ত নাই; চারিদিক হইতেই কেবল নাই নাই শব্দ উত্থিত হইতেছে; বাঙ্গালীর মন আজ নিরাশা ও নিরুৎসাহের ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন।

আশ্বিন মাস আসিয়াছে, তাই নিরানন্দের এই ঘনান্ধকারের মধ্যে আনন্দের একটি ক্ষীণ রশ্মি দেখা যাইতেছে। কয়দিন পরে মা আনন্দময়ীর আগমন হইবে সেজন্য বাঙ্গলীর মনে শত অভাবজনিত নিরানন্দের মধ্যেও আনন্দের ক্ষীণ রেখা যাইতেছে। মহিষমর্দ্দিনী দশভূজা জগজ্জননীর পূজার সর্ব্ববিধ উপকরণে দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থায় দুর্লভ ও দুর্মূল্য হইলেও মাতৃভক্ত শক্তিপূজকগণ যথাসাধ্য পূজোপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। যে দেবীর আগমনের পূর্ব্বাভাষেই নিরানন্দের নরকে আনন্দের আলোক দেখা দিয়াছে, স্বর্গের সুরভি নিশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে সেই আনন্দময়ী মহামায়া দেবী কে? কিরূপে তঁহোর উৎপত্তি, এবং তাঁহার কার্য্যই বা কিরূপ এই সব কথা জানিবার ইচ্ছা প্রত্যেক শক্তিপূজকের মনেই উদ্ভূত হয়।

সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলা দেশে অকাল বোধন করিয়া যে সিংহবাহিনী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী, দশভুজা দেবীর পূজা করা হয় তাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্য সপ্তশতী চণ্ডীর অনুসরণ করিয়াই করা হয়। মায়ের পূজার সহিত শ্রীশ্রীচণ্ডী এরূপভাবে ওতপ্রোত যে চণ্ডীপাঠ না করিলে জগন্মাতার পূজা পূর্ণ হয় না, আর ঘটেও মায়ের পূজা করিয়া চণ্ডীপাঠ করিলে দেবী পূজা সম্পূর্ণ হয়। কাজেই শ্রীশ্রীচণ্ডীতে জগজ্জননীর সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই আমাদের আমাদের কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য।

বাংলার হিন্দুগণ শরৎকালে যে মূর্ত্তির পূজা করে তাহা দেবী মাহাত্ম্যে শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বিতীয় মাহাত্ম্যে যে সিংহবাহিনী দশভূজা জগজ্জননীর বর্ণনা আছে সেই অসুর বিনাশে নিযুক্তা দশভূজা মূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তি মুখ্য হইলেও ঐ মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে আরও কয়টি মূর্ত্তি দেখা যায়; দক্ষিণে ঐশ্বর্য্যসম্পদের দেবতা লক্ষ্মী ও জ্ঞানের আধারগণ দেবতা গণেশ; বামে শিল্পকলা-সঙ্গীতবেদসংহিতা দর্শন প্রভৃতি সর্ব্ববিদ্যার জননী বাগ্দেবী সরস্বতী ও তারকাসুর নিধনকারী দেবসেনাপতি অস্ত্রধারী কার্ত্তিক। বোধ হয় মায়ের পূজা সত্য ও সফল হইলে ভক্তের গৃহে, সমাজে ও দেশে জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও শৌর্য্য পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া উঠে তাহাই জ্ঞাপন উদ্দেশ্য ঐ মূর্ত্তিগুলি মায়ের দুই পার্শ্বে স্থাপিত।

এই দেবী কে, কখন কিরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, চণ্ডীতে তাহা বিশদরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। হৃতস্বাম্য অতি দুঃখিত সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য বিশ্বরহস্যের কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিহ্বল। যাহাদের অন্যায় আচরণে তাহাদের এই দুর্দ্দশা তাহাদেরই জন্য প্রাণ কাঁদে কেন তাহার কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া মেধস্ মুনির নিকট গমন করিলেন এবং মুনিবরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাহাদের সংশয় নিরসনের জন্য অনুরোধ করিলেন। মেধস্ মুনি বা ঋষি বিশ্বরহস্যের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া তাহাদের সংশয় নিরসন করিলেন। তিনি সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের মূলশক্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে সবই

বলিলেন। যাঁহারা এ বিষয়ে জানিতে চাহেন তাঁহারা চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ের প্রায় এক শত শ্লোক পাঠ করিলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন—ঐটুকু শ্রম করিতে অনিচ্ছুক হইলে প্রথম অধ্যায়ের ৫১।৫২।৫৭।৫৮।৬৮।৬৯।৭০।৭১ শ্লোকগুলি বুঝিয়া পড়িলেই উদ্দেশ্য লাভ হইবে। মেধস্ ঋষি বলিলেন, তিনি নিত্যা এবং এই বিশ্বই তাঁর মূর্ত্তি—তিনি বিশ্বরূপা তাঁর জন্মও নাই—বিনাশও নাই। তবে দেবগণের অর্থাৎ সৃষ্টিপ্রবাহের অনুকূল ভগবদ্ভক্তগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তিনি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। এই কথা বলিয়া মহিষাসুরমর্দ্দিনীর উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন।

সদসৎবিবেকশূন্য ন্যায়-অন্যায় বোধ রহিত অন্যায়কারী মহিষাসুর দেবগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের নিজ নিজ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিল। হৃতাধিকার দেবগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া হরি ও হরের নিকট গমন করিলেন এবং অসুর নিপীড়নজনিত তাহাদের ক্ষোভের কথা নিবেদন করিলেন। দেব নির্য্যাতনের কথা শুনিয়া হরি ও হরের মনে ক্রোধ জন্মিল এবং তাঁহাদের ভ্রুকুটি কুটিল ললাটতল হইতে ক্রোধসঞ্জাত তেজ নির্গত হইল; অন্য দেবতাগণের শরীর হইতেও ঐরূপ ক্রোধসঞ্জাত তেজ নির্গত হইল। ঐ সমস্ত দেবতেজ ঐক্য প্রাপ্ত বা একত্রিত হইয়া দিকসমূহকে জ্বালা-ব্যাপ্ত করিয়া জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় প্রতিভাত হইল। পরে

সেই সর্ব্বদেব শরীরজাত তেজ নারী মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। তিনিই দশভূজা সিংহবাহিনী বিশ্বজননী এবং তিনিই মহিষাসুর বধ করিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, হরি, হর, ব্রহ্মা ও অন্য সমস্ত দেবতা বিশ্বজননীর অঙ্গীভূতা; তিনিই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী ব্রহ্মময়ী।

আমরা যে দুর্গা পূজা করি তাহা কি সত্যই মহাশক্তির পূজা হয়? মায়ের পূজা করিতে হইলে চাই ধর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং অধর্ম্ম অন্যায়ের প্রতি ক্রোধ। অন্যায় অধর্ম্মের প্রতি ক্রোধ না জন্মিলে, তাহার প্রতিকারে প্রয়াস না পাইলে ধর্ম্মের গ্লানি জন্মে—ধর্ম্ম লোপ পায়। যে অন্যায় করে এবং যে অন্যায় সহে জগজ্জননীর ক্রোধ সে দুই জনকেই শুষ্ক তৃণের মত দহন করে। অসুর নিপীড়নের কথা শুনিয়া দেবগণ ভ্রুকুটি কুটিলানন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দেহ হইতে তেজ নির্গত হইয়া ঐক্য প্রাপ্ত হইয়াছিল আমাদের তাহা হয় কৈ? আমরা কোন মুখে অসুর নিধনের প্রার্থনা করিব? আমাদের মনই যে আসুরিকভাবে পূর্ণ! আমরা মায়ের কাছে অজ্ঞানের প্রতীক কুষ্মাণ্ড বলিদান দিই কিন্তু আমাদের মনের মাচায় যে রাশি রাশি কুষ্মাণ্ড ফলিয়া রহিয়াছে তাহা বলিদান করি কৈ? তাইত আমাদের পূজা ঠিক হয় না—মায়ের আশীর্ব্বাদও লাভ করি না।

আসুন নিপীড়িত দেবগণ, নির্য্যাতিত জনগণ, আজ আমরা

আমাদের সর্ব্বস্ব, আমাদের বাক্-মন-কায় মায়ের চরণে অর্পণ করিয়া সঙ্কল্প পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রার্থনা করি আমরা যেন সত্যই শক্তিপূজক হই ; আমরা যেন সর্ব্বার্থ সিদ্ধিরূপ মায়ের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃত কৃতার্থ হই। দেশে যেন বিদ্যা, শিল্প, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও শৌর্য্য বিকশিত হয় ; সিংহ-বাহিনী দশভূজা বিশ্বজননী যেন আমাদের দেশের সর্ব্বত্র নিত্যারূপে অধিষ্ঠিতা হ'ন। সর্ব্বান্তর্য্যামিনী বিশ্বজননীকে ত মিথ্যার দ্বারা লোক দেখান ভক্তি শ্রদ্ধার দ্বারা প্রতারিতা করা যায় না ; চাই ঐকান্তিক নিষ্ঠা, বিমলাভক্তি সর্ব্বস্ব সমর্পণ ; তাহা হইলে মায়ের আশীর্ব্বাদলাভে ধন্য হইব।

যদিও অভাব-অসুরের নিপীড়ণে হিন্দু বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দু আজ মুহ্যমান ; অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য, ঘৃত, তৈল, লবণাদি সর্ব্ববিধ আবশ্যক দ্রব্য দুর্লভ ও দুর্মূল্য, তবুও আনন্দময়ীর আগমনে নিরানন্দ বঙ্গগৃহেও আনন্দের ক্ষীণ শিহরণ জাগিয়াছিল। ষষ্ঠীতে মায়ের অকাল বোধন হইল ; সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে যথাসাধ্য উপাচারে মায়ের পূজা হইল এবং পূজা সম্পূর্ণ করিবার জন্য বলিও দেওয়া হইল, কুষ্মাণ্ড, অজ, মেষ, মহিষ। দশমীতে দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নিরঞ্জনের পর মায়ের সন্তানগণ, মায়ের ভক্তগণ, প্রীতিভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল। পূজা শেষ হইল। পূজা যে শেষ হইল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ বা সংশয় নাই ; তবে মনটা সংশয়সমাকুল হইয়া কেবলই প্রশ্ন করিতেছে পূজা শেষ হইয়াছে সত্য,

তবে পূজা কি সম্পূর্ণ হইয়াছে? পূজা কি সফল হইয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে যে দেবীর পূজা করিলাম তিনি কে, তাঁহার পূজার কি ফল, কি হইলে তাঁহার পূজা সম্পূর্ণ ও সফল হয় প্রভৃতি তথ্য জানিবার চেষ্টা করা ভিন অন্য উপায় নাই।

বাংলার হিন্দুগণ শরৎকালে যে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির পূজা করে তাহা প্রায়শঃ দেবী মাহাত্ম্য সপ্তশতী শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বিতীয় মাহাত্ম্যে যে মহিষাসুরনাশিনী সিংহবাহিনী দশভূজা জগজ্জননীর বর্ণনা আছে সেই মূর্ত্তি। অসুর বিনাশে নিযুক্তা দশভূজা মূর্ত্তিই মুখ্য হইলেও ঐ মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে আরও কয়েকটী দেবতার মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা দেখা যায়; দক্ষিণে ঐশ্বর্য্যের দেবতা লক্ষ্মী ও জ্ঞানের আধার গণদেবতা গণেশ এবং বামে শিল্পকলা সঙ্গীত দেবসংহিতাদর্শন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিদ্যার জননী বাগ্দেবী সরস্বতী ও তারকাসুর নিধনকারী দেবসেনাপতি ধনুর্দ্ধারী কার্ত্তিক। বোধ হয় মায়ের পূজা সম্পূর্ণ হইলে ভক্তের গৃহে, সমাজে ও দেশে জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও শৌর্য্য পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া উঠে এই কথাটি জানাইবার উদ্দেশ্যেই ঐ মূর্ত্তিগুলি মায়ের পার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে। ঐ দেবী কে, কখন, কিরূপে, কিজন্য আবির্ভূতা হইয়াছিলেন শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তাহা বিশদরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। দেবীপূজা বা মহাশক্তির আরাধনা মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপরই প্রতিষ্ঠিত; সেইজন্য বিনা চণ্ডীপাঠে দুর্গাপূজা হয় না।

চণ্ডীতে দেখা যায় হৃতস্বাম্য অতি-দুঃখিত সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য বিশ্বরহস্যের কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিহ্বল হইয়া পড়েন। যাহাদের অন্যায় আচরণে তাঁহাদের দুর্দ্দশা তাহাদেরই জন্য প্রাণ কাঁদে কেন তাহার কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া মেধস্ মুনির নিকট গমন করিয়া মুনিবরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাঁহাদের সংশয় নিরসনের জন্য প্রশ্ন করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ বা ঋষি মেধস্ বিশ্বরহস্যের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহাদের সংশয় নিরসন করিলেন। মেধস্ ঋষি বলিলেন,—

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ॥

বিষয়-দোষজ্ঞান সত্ত্বেও জীবগণ মহামায়ার প্রভাবে মোহহ্রদে মমতার আবর্ত্তে নিপতিত হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিয়া থাকে।

সুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্য ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না দেখিয়া ঋষি মহামায়া সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিলেন; তাহার মধ্যে দেখিতে পাই,—

তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈবা প্রসন্না বরদা নৃনাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সা বিদ্যা পরমামুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসার বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

সেই মহামায়া বিবিধ প্রকারে স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বের

সৃষ্টি করেন, তিনি প্রসন্না হইলে মানবগণের মুক্তির জন্য বর প্রদান করিয়া থাকেন। সেই মহামায়াই পরমা-বিদ্যারূপে (তত্ত্বজ্ঞানরূপে) মুক্তিদাত্রী হইয়া থাকেন; আবার তিনিই অবিদ্যারূপে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করেন; তিনি সনাতনী এবং সর্ব্বেশ্বরেরও ঈশ্বরী অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের নিয়ন্ত্রী।

মেধস্ ঋষি এইরূপ জ্ঞানগর্ভ বাক্যসমূহের দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশের কারণ স্বরূপা মহামায়ার কথা বলিলেন। যে শক্তি হইতে সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ হয় বেদে তাহা ব্রহ্ম বলিয়া উল্লিখিত, আর দেবী-মাহাত্ম্য প্রকাশক মার্কণ্ডেয়াদি পুরাণে ও তন্ত্রসমূহে তাঁহাকেই মহামায়া মহাশক্তি, জগজ্জননী বলা হইয়াছে। তিনি লিঙ্গাতীত, কাজেই তাঁহাকে মা অথবা বাবা যেভাবে ভক্তের মন চাহে সেই ভাবে তাঁহার ধ্যান ধারণাদি করা চলে। ভক্ত রামপ্রসাদ তাই গাহিয়াছেন, "জাননা রে মন, পরম কারণ কালী কেবল মেয়ে নয়। মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখনো কখনো পুরুষও হয়।" যে শক্তি হইতে সৃষ্টি-স্থিতিলয় হয় তাঁহাকে মেধস্ ঋষি বিশ্বজননীরূপে ধারণা করিয়াছেন।

সংসার মমতাবর্ত্তে নিপতিত সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য মহামায়ার বিষয় সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার আকাঙ্ক্ষায় প্রশ্ন করিলেন,—

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যং ভগবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মস্যশ্চ কিংদ্বিজ॥

ভগবান্, আপনি যাহাকে মহামায়া বলিতেছেন সেই দেবী কে? কিরূপে তাঁহার উৎপত্তি এবং তাঁহার কর্ম্মই বা কিরূপ?

উত্তরে মেধস ঋষি বলিলেন,—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্ব্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

সেই মহামায়া দেবী নিত্যা, সনাতনী, অনাদ্যবন্তা অর্থাৎ তাঁহার আদিও নাই অন্তও নাই; যখন সৃষ্টি ছিল না তখনও তিনি ছিলেন, যখন সৃষ্টি বিলুপ্ত হইবে তখনও তিনি থাকিবেন। তিনি জগৎস্বরূপা বা বিশ্বরূপা। তিনিই এই জগৎ প্রসারিত করিয়াছেন। তিনি নিত্যা হইলেও আমার নিকটে বহুপ্রকারে তাঁহার আবির্ভাব কথা শ্রবণ করুন। তিনি যদিও নিত্যা তথাপি দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য যখন তিনি আবির্ভূতা হন তখন তিনি উৎপন্না বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকেন।

বুকের উদ্গার

১। প্রকৃতি

শ্রুতির আদেশ 'সর্ব্বান্ মৎস্যান্ পয়সং সহ নাভ্য বহরেৎ" অর্থাৎ আমিষ খাদ্য দুধের সঙ্গে খাবে না, কারণ ঐ দুই খাদ্য বিরুদ্ধ প্রকৃতি। মধু ভাল জিনিস ঘৃতও ভাল জিনিস, তবু কিন্তু ঐ দুয়ের মিল—মধুসর্পি-বিষ। দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতি খাদ্য একসঙ্গে উদরে প্রবেশ করলে বিদ্রোহের সৃষ্টি করে উদরাময় হয়, ভেদ বমি হয়, কখন কখন খাদককে স্বর্গবাসীও হতে হয়। আহারেও যেমন বিহারেও তেমনি বিরুদ্ধ প্রকৃতি সমাবেশে বহু বিভ্রাটই ঘটে। ব্যক্তি ও সমাজজীবনেও বিরুদ্ধ প্রকৃতি সমাবেশে কত যে বিপ্লব ঘটে তা গুণে শেষ করা যায় না। শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন ঃ—

প্রকৃত্যোঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মানি সর্ব্বশঃ।

অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে॥

কিন্তু কতকগুলো অহঙ্কারী বিমূঢ়াত্মা বুদ্ধিভ্রষ্ট মানুষ আপনাদিগকে বিশ্বকর্ত্তা মনে করে এবং প্রকৃতিকে অস্বীকার ক'রে চলে ও পৃথিবীতে নরকের সৃষ্টি করে বসে।

এই প্রসঙ্গে একটা দুঃখের কথা মনে পড়ল; কথাটা বলি। আমাদের গ্রামে একটা পাগল ছিল; সে ছোটবেলায় অনেকখানি পড়াশুনো করেছিল। তারপরে তার মাথাটা

গেল গুলিয়ে। দিনরাত ভাবত সে নিজেই ব্রহ্মা, নিজে বিষ্ণু, নিজে মহেশ্বর ; সেই বিশ্ব গড়ছে, বিশ্ব পালছে, বিশ্ব ভাঙ্গছে। তার পাগলামিটা আর এক দিকে প্রকট হয়ে উঠল। বেদাদি শাস্ত্র মায় আয়ুর্ব্বেদকে নাকচ করে তোলাই তার জীবনের ব্রত হয়ে উঠল ; অতীতের সব লেখাগুলো তক্তি* হতে মুছে ফেলে নূতন লেখা লিখবার স্পর্দ্ধিত সাধনায় সে মস্‌গুল হয়ে গেল। প্রকৃতির বৈষম্যের কথা সে মানত না, প্রকৃতির সাম্যের কথাই সে জোর গলায় জাহির করত। তেলে-জলে মিশ খায়না শুনে কথাটাকে মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্যে সে একটা শিশির মধ্যে খানিকটা তেল ও খানিকটা জল পুরে দিন রাত নেড়ে নেড়ে তেল ও জলকে মেশাবার চেষ্টা করত এবং "মিশেছে, মিশেছে" বলে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠত। কিন্তু না নেড়ে শিশিটাকে কিছুক্ষণ রেখে দিলেই তেল আর জল আলাদা হয়ে পড়ত।

বহু পুরাতন অভিজ্ঞতা, সাপ আর নেউলে প্রীতি বন্ধন হয় না। পাগলের খেয়াল হ'ল কথাটাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে হবে। কোথা হতে এক বিষধর সাপ ও একটা বেজি সংগ্রহ করে কাষ্ঠ ও লৌহ নির্ম্মিত একটা বৃহৎ খাঁচায় পুরে তাদের মধ্যে মিলন সম্পাদনে ব্যস্ত হ'ল। বেজি ও সাপ প্রকৃতির অনুসরণ করে প্রাণপণ লড়াই-এ মেতে উঠল। যখন তারা

*মুসলমানের মক্তবে যে কাঠের প্লেট পূর্ব্বে ব্যবহৃত হ'ত তাকে তক্তি বলা হ'ত—এখন কি হয় জানি না।

বহুক্ষণ লড়াই-এ ক্ষতবিক্ষত দেহ এবং রক্তপাতে অবসন্ন হয়ে পড়ল তখন পাগল খাঁচার দ্বার খুলে সাপ ও বেজিকে শান্ত করবার এবং তাদের মিলন ঘটাবার শেষ চেষ্টা করতে গেল। কিন্তু সর্প ও নকুল উভয়েই পাগলকে এ ভাবে কামড়াল যে সঙ্গেসঙ্গেই তার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটল। পাগল মরায় দুঃখ ছিল না; কিন্তু ঐ ক্ষিপ্ত বেজি ও সর্প গ্রামের অনেকের প্রাণনাশের কারণ হ'ল এইটাই বড় দুঃখ। তাই বলি ভাই সকল, ওজন বুঝে ভোজন করো আর প্রকৃতিকে মেনে চলো।

২। অর্থ

ভাই সকল, সেদিন তোমাদিগকে শব্দ সম্বন্ধে গল্প বলেছি, আজ বল্‌ব অর্থ সম্বন্ধে দু'চারটে কথা। ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের মোহদুর্গ চূর্ণ করবার জন্য "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং"-রূপ যে মুদ্গর প্রয়োগ করেছিলেন তাতে অর্থ মানে ধন-সম্পদ আর এখানে অর্থ মানে মানে। মানে-মানে গল্পটা শেষ করতে পারলে বাঁচি। এখন অর্থ সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলি। কথা মানেই গল্প; বিশ্বাস না হয় নজির দিচ্ছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথামালা, বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চতন্ত্র, গ্রীক-ঈশপের রূপকথা, সবই নিছক আফিমখোরের গল্প—শেয়াল-সিংহের মুখে, কাক-বকের মুখে, হংস-কচ্ছপের মুখে বিজ্ঞ-

জনোচিত বাক্য বসিয়ে রচা গল্প। গ্রীসের ঈশপ আর আমাদের দেশের বিষ্ণুশর্ম্মা থেকে আরম্ভ করে আজকের দিনের হরেদরে সবই শুধু কথার বেসাতিই করে চলেছে; বেদব্যাস হ'তে আরম্ভ করে রঘুনন্দন পর্য্যন্ত—ভুল হলো—কলির মনু আম্বেদকর আর কলির মন্ত্রী রেণুকা রায় পর্য্যন্ত সবাই কথা গেঁথে গেঁথে নিছক গল্পের বেসাতিই করে চলেছে। শুধু কি তাই? দিল্লীর ময়ূরতখ্তে আসীন রাষ্ট্রপতি হতে আরম্ভ করে মিউনিসিপ্যালিটির পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কারক কর্ম্মী পর্য্যন্ত সবাই কথা বা গল্পই রচে চলেছে।

আঃ, তোমরা দেখছি ভাই গল্প শুনতে পারবে না। অত সত্যনিষ্ঠ, অত যুক্তিশীল হলে কি গল্প শোনা চলে? রাম-রাঘব রাজা রামের মুখ্য সৈনিক গয়, গবাক্ষ, নল, নীল প্রভৃতি অরণ্যপূর্ণ ভারতের সঙ্গে সংযোগসেতু রচনা ক'রে স্বর্ণলঙ্কায় পাড়ি মেরেছিল আর লড়াই ফতে করে অমৃত পরশে মরেও বেঁচে উঠেছিল আর সুন্দরী সুন্দরী রাক্ষসী নিয়ে স্বর্ণমণ্ডিত গৃহে সুখে দিন কাটিয়েছিল। তোমরাও যদি জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে চাও তাহলে শ্রেষ্ঠদের অনুকরণ করে স্বর্ণলঙ্কার সাথে সংযোগসেতু রচনা করে চল। সত্য, যুক্তি, মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি জিনিসগুলো যে খুবই মুল্যবান তা জানি, আরও জানি সেও লোকে পেটিকাবদ্ধ করে গডরেজ সেল্ফের মধ্যে তালা এঁটে রেখে দেওয়াই ভাল মনে করে; নিত্য জীবনের ধুলা-কাদার মধ্যে ঐসব মণিমুক্তা বার করলে ঠকতেই

হবে। তোমরা বল্‌ছ ময়ূরতখ্‌ত নাই ; নাই যে তা জানি, সেটা যে লুট হয়ে গেছে, চুরি হয়ে গেছে পুরাতন ইতিহাস যারা পড়েছে তারাই সেটা জানে, নূতন ইতিহাসের কথা আলাদা হতে পারে। তবে এটাও ত জান যে চাকরের বদলে যে কাজ করে সেই চাকর। ময়ূরতখ্‌তের বদলে যে আসনটা আজ চালু হয়েছে সেইটেই ময়ূরতখ্‌ত। বিকল্প, বদলী, ঔজি, মধ্বাভাবে গুড় প্রভৃতি কথাগুলো আজও ত দেশ ছেড়ে চলে যায় নি।

যাক্ এখন গল্পই বলি। সব কথা, সব গল্পই শব্দ দিয়ে রচা। শব্দ মাত্রেই অর্থ থাকা চাই—শব্দের সঙ্গে অর্থের নিত্যসম্বন্ধ। কালিদাস, বলেছেন শব্দ ও অর্থ হরপার্ব্বতীর মত নিত্যযুক্ত, "আধ গলে শোভে গরল কালা, আধ মণিময় হার উজলা" হলেও দুয়ে মিলে একটি গলা। কিন্তু এ ভাবে নিত্যযুক্ত হলেও এবং হিন্দুর শাস্ত্রে তালাকের ব্যবস্থা না থাকলেও দেখা যায় কোন কোন শব্দ পূর্ব্বার্থ ত্যাগ করে নূতন অর্থ গ্রহণ করে অর্থাৎ তালাক দিয়ে নেকা করে। এই দেখ না "ক্ষৌমবস্ত্র" ; পূর্ব্বে তার অর্থ ছিল "খুঁয়ে কাপড়" অর্থাৎ তিসি গাছের শন হতে তৈরি কাপড়। যদিও আজিও আমাদের দেশে অনেক খুঁয়ে তাঁতি রয়েছে, যদিও উপনয়ন, গাত্রহরিদ্রা প্রভৃতি মাঙ্গল্য কার্য্যে ফর্দ্দ অনুযায়ী খুঁয়ে কাপড়ের কাজটা বদলি দিয়েই সারা হয়; তবুও ক্ষৌম-বসন এখন মূল্যবান পট্ট বা গরদবস্ত্রের উচ্চাসনে উপবিষ্ট।

পুরাতন কেতাবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় পাই "অতসী কুসুম জিনি সুকোমল তনুখানি" ; সেখানে অতসী কুসুম মানে তিসির ফুল, সেটা নীলাভ এবং যত্নত্র কুসুম। অতসী তার পূর্ব্বের অর্থটা গরপছন্দ করে অন্য অর্থের সঙ্গে মিলিত হয়েছে' অর্থাৎ অহিন্দুর মত পূর্ব্ব অর্থটাকে তালাক দিয়ে একটা নূতন অর্থ নিয়ে ঘরকন্না করছে। এখন অতসী মানে কাঁচা সোণার মত রং বনসোণা ফুল আর তাই দুর্গাপূজার সময় জগণ্মাতার বর্ণনায় মনে আসে "অতসী পুষ্প বর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠং সুলোচনাং", যদিও অনেক স্থানে ওর বদলে "তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠং সুলোচনাং" বলা হয়। দেখলেন ভাইসকল, শব্দমহলে কি মজাদার পরিবর্ত্তনই চলেছে। পূর্ব্বে ক্বচিৎ কোন শব্দ পূর্ব্বার্থ ত্যাগ করে নবার্থ গ্রহণ করত, শব্দগুলোর মধ্যে খুব কম শব্দেরই ঐরূপ দুর্ম্মতি ঘটত। কিন্তু আজ? আজ যখন সারা দেশটা মৈত্রীর নেশায় মশগুল্, যখন মুসলমানের হনুকরণ করে হিন্দুর মেয়ের তালাকের অধিকার আইন রচে কায়েম করা হচ্ছে, তখন আমাদের শব্দগুলো যে তালাক দেওয়া ও নেকার কাজে মেতে উঠবে তাতে বিস্ময়ের বিষয় যে কিছুই নেই তা ত অনস্বীকার্য্য। তাই ত আজ প্রগতি-স্রোতে ভেসে যাওয়া আমাদের দেশে সৃষ্টি মানে হয়েছে অনাসৃষ্টি, স্বাধীনতা মানে হয়েছে হাতে পায়ে বন্ধন, উন্নতির মানে হয়েছে রসাতলে অবতরণ, মিলনের মানে হয়েছে ছোরাছুরীর অবাধ ব্যবহার, মৈত্রীর মানে হয়েছে দাঁতেজিভে,

সংভরণের মানে হয়েছে সংহরণ, ধনিকতন্ত্র নিরসন মানে চীরবাস-অর্দ্ধভুক্ত জনগণের অস্থি-মজ্জা চুর্ণ করে বস্ত্রকলওয়ালা ও চিনিকলওয়ালাদিগকে দুই চারিশত কোটী টাকা পাইয়ে দেওয়া, আর সাম্যের মানে একদিকে পাহাড় পর্ব্বত ও অন্যদিকে গাড়াগর্ত্ত রচনা করা। কত শব্দের যে পুরাতন মানে পাল্‌টে এখন নূতন মানে হয়েছে তা গুনে শেষ করা যায় না।

প্রায় তিন কুড়ি দশ বছর আগে কবি কামিনী সেন (পরে কামিনী রায়) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, "জীবনে ও কপটাচরণে শেষে আর ভেদ নাহি রবে" ; ঐ শেষ যে কবে তা কোন দিনই বুঝতে পারি নি ; তবে কিছুদিন হতে মনটা সংশয় নাগরদোলায় ঘুরপাক খাচ্ছে, মাঝে মঝে মনে হয় বুঝিবা সেই শেষ এসে পড়েছে। যখনই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতির জন্য মনমোহনকর কোন পরিকল্পনা প্রচারিত হয় তখনই একটা উল্টা কিছু হবার আশঙ্কায় মনটা ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়ে। ভয় কি এম্‌নি হয়? শুনেছি কলির মানুষকে মোহিত করবার বিহ্বল করবার মহদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েই ভগবান মহাদেব মোহ-শাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। আজও যখন কলির শেষ হয় নাই এখনও যখন কলি খুশমেজাজে বাহাল তবিয়েতে বিরাজমান তখন আরও কত তন্ত্র, কত মোহশাস্ত্র রচিত হবে, কে জানে? যত তন্ত্রই রচিত হোক, যত প্রচারই বিসর্পিত

হোক, অর্থ নিয়েই যত অনর্থ। তাই ভয়ভাবনা হয়, আর জড়িবুটি রোজা ওষুধ খুঁজতে হয়।

পুঃ—দণ্ডকারণ্যবাসী এক অবধূত বন্ধু কাল আমাকে একটি রক্ষাকবচ পাঠিয়েছেন। তিনি লিখেছেন এ কবচ অব্যর্থ, সদাসফল। এখন অবধূতেরাও বিশ্বাস্য কিনা বুড়োর পাতঢাকা ঝাপসা চোখে ঠিক ধরতে পারি না, তোমাদের তরুণ চিল-বিজয়ী দৃষ্টিতে সত্য নির্ণয় করো। যদি রক্ষাকবচটা তোমাদের কাজে লেগে যায় তাই সেটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভুর্জপত্রে আলতার রঙ্গে শরের কলমে লিখে, সোনার মাহুলিতে পুরে মঙ্গলবারের মধ্যনিশায় মহিযাসুরমর্দ্দিনী জগন্মাতাকে প্রণাম করে দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করলে সব মোহ-পাপ-তাপ-ব্যসন-বিপর্য্যয় দূর হবে।

অবধূত প্রেরিত রক্ষাকবচ।

রাম রাঘব সমর্পিত চিত্তং
অপিত তির্য্যগ্দৃষ্টি বিত্তং ॥
জনহিত বাণীকণ্ঠা বলিপ্তং।
অর্থমনৃতং চ ভাবয় নিত্যং ॥

৩। কথা ও কাজ

পৃথিবীর বুকে নানা রংএর, নানা গঠনের, নানা ভাবধারার নানা জীবনযাপন ধারার মানুষ বাস করে। শ্বেত, লোহিত,

পীত, বাদামী, কৃষ্ণ প্রভৃতি রংএর ; আর্য্য, ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, অষ্ট্রেলেসীয় প্রভৃতি গঠনের ; হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান মুসলমান, জৈন, শিখ, গাছ পাথরাদির উপাসক প্রভৃতি নানা ধর্ম্মের ; হিন্দু, চৈনিক প্রভৃতির দেহ ও আত্মার সামঞ্জস্য সাধন উপযোগী সহজ সরল জীবনযাত্রা ; ইউরোপ আমেরিকার মানুষের দেহাত্মবাদী, দেহসর্ব্বস্ব জটিল জীবনযাত্রা ; ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়ার আদি-বাসীদের প্রকৃতি অনুসারী পশু হইতে অল্পমাত্রা ব্যবধানের জীবনযাত্রা—আপাতঃ দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে অনেকটুকু পার্থক্যরই সৃষ্টি করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও একটা ঐক্যসূত্র মানুষ মাত্রেরই মধ্যে দেখা যায় ; সত্য মিথ্যা বোধে ন্যায় অন্যায়ের ধারণা, মহত্ত্ব নীচত্বের জ্ঞান, যুক্তি বিবেক প্রভৃতি সেই ঐক্যসূত্র। ঐ ন্যায়ান্যায় সত্য-মিথ্যা বোধ থাকা সত্ত্বেও সব দেশেরই সব সমাজেরই বহু মানুষের মধ্যে কথায় ও কাজে সামঞ্জস্যের স্থানে পার্থক্যই দেখা যায়। মুখে বলে এক কথা এবং কাজে করে অন্যরূপ, এরূপ মানুষের সংখ্যা মনুষ্যসমাজে বড় কম নয়। ঐরূপ আচরণকে ছলনা, কপটাচরণ, মিথ্যা প্রভৃতি দোষ বলা হয়। ঐ সব দোষগুলি মানুষের, তা ব্যষ্টিই হোক বা সমষ্টিই হোক। বহু অমঙ্গলের কারণ হলেও সেগুলো মনুষ্য-সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে সত্য, আর্জ্জব

প্রভৃতি গুণগুলিকে দৈবী সম্পদ বা দেবোচিত গুণ এবং তদ্বিপরীত দম্ভ, দর্প, ক্রোধ প্রভৃতি গুণগুলিকে আসুরী বা অসুরোচিত গুণ বলেছেন। তাঁহার উক্তি এই,—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥
অহিংসাসত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥

নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানোপায়ে পরিনিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ, বেদাদিপাঠ, তপ, ঋজুতা বা সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দাবর্জ্জন, প্রাণীর প্রতি দয়া, আলোলুপতা, মৃদুতা, হ্রী (কুকর্ম্ম করিতে লোক-লজ্জা), অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ (বাহ্যাভ্যন্তর শুচিতা), অদ্রোহ ও অনভিমানতা (নিজেকে অতি পূজ্য মনে না করা)। যাহারা দৈবী সম্পদ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করে, হে অর্জ্জুন, তাহারা উক্ত ষড়-বিংশতি গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥

হে পার্থ, যাহারা আসুর-সম্পদ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করে,

তাহারা দম্ভ, দর্প. অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানে অভিভূত হয়।

ভারতের ঋষি ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ, সাধু সন্ন্যাসীগণ, যিশু খ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি নর-মঙ্গলকামী মাত্রেই ঐ আসুরী সম্পদকে বিষবৎ ত্যাগ করে দৈবীসম্পদ-গুলির সাধনার দ্বারা জীবন সফল করবার কথাই বলেছেন। কিন্তু তবুও বহু মানুষ ঐ পথ না ধরে আসুরী সম্পদের সাধনাতেই মত্ত হয়ে চলেছে আর পৃথিবীকে শোকের গোলকে বা নরকে পরিণত করেছে।

এই আসুরী সম্পদ, এই মিছে কথা ছলনা, দম্ভ, দর্প, ক্রোধ প্রভৃতিই মানুষের দুর্দ্দশার কারণ। সব সময়েই মনীষিগণ মঙ্গল সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আসছেন কিন্তু তবুও মানুষের মধ্যে কাজে ও কথায়, মনে ও মুখে পার্থক্য বা কপটতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ছাতনার কবি চণ্ডীদাস চার শ বছর পূর্ব্বে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, “হৃদয় মুখেতে দুঁহু সমতুল কোটিকে গুটিক মেল”। মহিলা কবি কামিনী রায় প্রায় ষাট বছর পূর্ব্বে হতাশার ভাবেই বলেছেন, “জীবনে ও কপটাচরণে শেষে আর ভেদ নাই রবে।”

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বহু বৎসর পূর্ব্বে আমাদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন,—

আপনারে শুধু বড় বলে জানি
করি হাসাহাসি করি কানাকানি

কোটরে রাজত্ব ছোট ছোট প্রাণী
ধরা করি সরা জ্ঞান।

আমাদের শাসকগোষ্ঠি অনেকেই কবির কথাগুলি তাঁদের জীবনে সম্পূর্ণরূপে সত্য ও সার্থক করে তুলেছেন। তাঁরা নিজেদের এত বড় বলে জানেন যে, তাঁরা একদম অভ্রান্ত, ভগবান যদি থাকেন তিনিও ভ্রান্ত হতে পারেন কিন্তু শাসক-চক্র নির্জ্জলা অভ্রান্ত। তাইত দেশবাসী যতই চীৎকার করুক তাঁর কানে সেটা মিথ্যা ছলনা বলেই শোনায়; দেশের লোক অনাহারে মরলে শাসকদের চোখে সেটা সত্যি মরা নয়। যদি কেহ দুর্ব্বুদ্ধির বশে সেই শাসকদের সদুপদেশ দেবার সাহস করে তাহ'লে তার দুরবস্থার অন্ত থাকে না; শেষ পর্য্যন্ত পুলিশী লাঠি খেয়ে বা জেলে পচে "পয়ঃপানং ভুজঙ্গনাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্" কথাটা যে কত সত্যি তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে।

আমরা যদি মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ধাপ্পা, অনুনয়, কান্নাকাটি, পায়ে ধরা প্রভৃতিতে বিচলিত না হ'য়ে মনে মুখে এক করে খাঁটি দেশমঙ্গলকামী মানুষের মত হৃদয়স্থ ভগবান বা বিবেকের ইঙ্গিত স্বনুসরণ করি তাহ'লেই দেশ ও দশ রক্ষা পাবে; তা না হলে দেশ ও দশের রসাতল গমন কেউই আটকাতে পারবে না। মনে মুখে মিল রেখে, কাজে কথায় এক করে সত্য ও আর্জ্জবের অনুসরণ করে যদি আমরা চলি তাহ'লেই শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করে,—নিজেরাও বাঁচবো,

দেশটাকেও বাঁচাব। আমরা নিজেরা যদি খাঁটি মানুষ না হই তাহ'লে আমাদের প্রতিনিধিরা খাঁটি মানুষ হবে কি করে? আমরা যদি যুক্তি-আশ্রয়ী, বিবেক-অনুসারী, দেশ-মঙ্গলকামী না হয়ে লড়-বড়ে জোলাতাঁতি হই তাহ'লে আমাদের প্রতিনিধিরাও রেবতী-কন্যাই হবে আর আমাদের ঘরকন্না হবে গাছতলায় উবুড় হাঁড়ি।

৪। গুরু

মহাপুরুষ বলেছিলেন "গুরু মিলে লাখে লাখ, চেলা নাহি মিলে এক"। কথাটা কয় শত বছর ধরে চলে আস্‌লেও তার সত্যতায় সংশয় সন্দেহের কোন কারণেই ঘটে নাই এত দিন। মাঝখানে একটা সংশয় দেখা দিল। কিছুদিন আগে দেখা গেল এক গুরুর লাখে লাখে চেলা মিল্‌ল। বাইরে দেখে মানুষে মনে করলে চেলারা গুরুগত প্রাণ, গুরুদত্ত মন্ত্রসাধনে নিষ্ঠাবান, তাদের দেহ বাক্য ও মন একান্তভাবে গুরুচরণে অর্পিত। ভাবলাম মহাপুরুষের বাণী হয়ত তাঁর সময়ে সর্ব্বতোভাবে সত্য ছিল। কিন্তু এখন দেশ কাল পাত্রের সমাবেশ পাল্‌টে যাওয়ায় কথাটার সত্যতাও বদ্‌লে গেছে। এখন লাখে লাখ চেলা মিললেও গুরু মিলে এক আধটি।

ঐ গুরু-শিষ্যের ব্যাপারটা বেশ চলছিল; তাদের একাগ্র

সাধনা দেখে ঐ দলবহির্ভূত অনেকেরই মন আশায়, আনন্দে উৎসাহে ভরে উঠত; যারা গুরুর চেলা হবার সৌভাগ্য লাভ করে নাই তাদেরও অনেকে গুরুজীর শ্রদ্ধাশীল অনুগামী-রূপেই চলছিল। কিন্তু প্রতিকূল বিধাতা কোন আঁধার কোণে বসে আঙ্গুল নাড়ল আর চাকা ঘুরে সব ওলট পালট হয়ে গেল। দেশের তুর্ভাগ্যক্রমে গুরুজীর অন্তর্ধান ঘট্‌ল আর তার লাখে লাখ চেলা কোন অলক্ষিত গান্ধর্ব্ব অস্ত্র প্রভাবে পরস্পরের সঙ্গে স্বার্থের কোন্দলে মেতে উঠল। প্রত্যেকেই ভাবে সেই একা মাত্র গুরুর খাঁটি চেলা, আর সবাই মেকি; সেই একা গুরুর আদেশ, বাণী, মন্ত্র সাঁচ্চা-ভাবে বুঝেছে আর সকলে যা বুঝেছে তা ঝুটা, কাজেই সারা দেশটা খাঁটি-মেকির সাঁচ্চা-ঝুটার কোন্দলে ভরে উঠেছে; তাদের খেওখেয়ীতে কান ঝালাপালা।

কেন এই অভাবনীয় ব্যাপার ঘট্‌ল তার কারণ খুঁজে খুঁজে মনটা ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে শেষে বহু কষ্টে একটা শক্ত কারণে হোঁচট খেয়েছে। সে কারণটার কথাটা বলি। অন্যের সম্বন্ধে মানুষের যে ধারণা হয় সেটা তিনটে জিনিস থেকেই হয়। দেহ বাক্য ও মন ধরেই পরস্পরকে আমরা চিনি; ঐ তিনটাই আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি। তিনটা যদি শক্ত হয়, সত্যি হয় তাহলে আমাদের জ্ঞানও শক্ত হয় আর যদি ভিৎ আল্‌গা হয় তাহলে আমাদের জ্ঞানও সংশয়-সন্দেহাকুল না হয়ে পারে না।

দেখা যাক ভিৎ তিনটার কার মূল্য কত। প্রথম দেহ; এটা প্রত্যক্ষের বিষয়, কাজেই নিঃসংশয়ে শক্ত; কোন গোল নাই। দ্বিতীয় বাক্য, এটাও কর্ণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, কাজেই কথাগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। তবে তাদের উদ্দেশ্য, তাদের মানে নিয়েই যত গোল। "শুধু মিছে কথা ছলনা" মানুষের ঘাড়ে এমনভাবে ভর করেছে যে পঁচিশ বছর আগে ছাতনার কবি চণ্ডীদাস লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন, "হৃদয় মুখেতে দুঁহু সমতুল কোটিকে গুটিক মেল"। মনে মুখে এক এমন লোক কোটিতে একটা পাওয়া যায়। তাহলে দেখা গেল এ ভিৎ বড়ই নড়বড়ে। একবারেই নির্ভরের যোগ্য নয়। তৃতীয় মন বা চিত্ত। বহু প্রচলিত প্রবাদ বাক্য— "পরচিত্ত অন্ধকার", কাজেই পরের চিত্ত বা মনের সম্বন্ধে কিছু জানতে হলেই অনুমানের সাহায্য নিতে হয় আর অনুমান টেনে নিয়ে যায় ভুলের পথে। যাঁর ভিতরে সাধু মনের অনুমান করি তিনিই রূপাকে সোনা করবার প্রলোভন দিয়ে কিছু নিয়ে চম্পট দেন। রক্ষক মনে করে যার হাতে ধন প্রাণ সমর্পণ করি তিনিই ভক্ষক বা সংহারক হয়ে পড়েন।

মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞানের ইমারত যে তিনটে ভিতের উপর গড়া হয় তার দুটোই যখন নড়বড়ে তখন ইমারতটা খাড়া থাকতেই পারে না, আমাদের পরস্পরের জ্ঞানটা তাই ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা। তাই আজ দেখছি গুরুজী শিষ্যদের ঠিক বুঝতে পারেন নাই; শিষ্যেরাও গুরুজীর কথা ঠিক ধরতে

পারে নাই ; শিষ্যরা পরস্পরকে বোঝবার কোন চেষ্টাও করে নাই, বোঝেও নাই। তারা আপন আপন খেয়াল বশেই চলেছিল, আজও চল্‌ছে। সম্প্রদায়বহির্ভূত লোকেরা বল্‌ছে, হায় হায় একি হলো !

"উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।" আজ দেখছি অনেকেই বৈষ্ণব-কবির ভক্ত হয়ে উঠেছে। সেদিন রাস্তা ধরে চল্‌ছি হঠাৎ রাস্তার পাশের একটা ঘর হ'তে কানে ঢুকলো, "পিত্তলকা কাটারী কামে নাহি আওর উপরহি ঝক্‌-মকি সার"। কথাটা শুধু আমার কানেই নয় আরও অনেকের কানেই ঢুকল। তবে কথাটা এ কান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বেরিয়ে গেল ; মরমে পশ্‌ল না, প্রাণ আকুলও করল না। তাহলে ত হোতো ভালো।

৫। বুদ্ধি

একজন মহামনীষী বলেছেন মানবের জীবন-ব্যাপারে বুদ্ধিই একমাত্র মূলধন বা পুঁজি। জীবন-বাণিজ্যে প্রত্যেকেই আপন আপন পুঁজির অনুপাতে লাভ লোকসান করে যায়। গীতাতে ভগবদ্বাক্য "ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহু ইন্দ্রিয়েভ্য পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধি"—বিষয় সকল ও দেহ অপেক্ষা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ এবং মন

অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ দেখাও যায় মানুষের জ্ঞান, বল, চাতুর্য্য প্রভৃতি সবই নির্ভর করে বুদ্ধির উপর। কথায় বলে "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য অবোধস্য কুতো বলম্"। মানুষের অপদার্থতা জ্ঞাপনের জন্য বলা হয় নির্ব্বোধ, বেকুফ্। ঐ শব্দগুলো গালিরূপেই ব্যবহৃত ও গৃহীত হয়। এরূপ মূল্যবান জিনিস বুদ্ধির সম্বন্ধে ভারতের অতীতকালের মনীষিগণ যে বহু আলোচনাই করেছেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই ঃ তাঁরা বুদ্ধির বহুবিধ শ্রেণী বিভাগ করেছেন। আজ শুধু তিনটা স্থূল বিভাগের কথাই বল্‌ব। বিচিত্র জীবনপথে চলতে চলতে বুদ্ধির লেনদেন সুদে আসলে তোমাদের বুদ্ধির তহবিল যখন খুব ফেঁপে উঠবে তখন তোমরাও অনেক নূতন বিভাগ জান্‌তেও পারবে রচনাও করবে।

বুদ্ধির যে তিনটা বিভাগের কথা বলব বলেছি তার প্রথমটা হলো (১) বেগাচিরা, (২) চিরাচিরা, (৩) বেগাবেগা, ৪) চিরাবেগা

বেগাচিরা—এই বুদ্ধি প্রভাবে কোন বিষয় খুব অল্প সময়ে ায়ত্ত হয় এবং চিরকাল মনে গাঁথা থাকে ; ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্ধি। এ বুদ্ধি যার তার সব কথা মনে থাকে, কাজেই ঠকে ।।

চিরাচিরা—কোন বিষয় আয়ত্ত করতে অনেক সময় লাগে বে সেটা মনেও থাকে অনেক দিন ; এটা দ্বিতীয় স্তরের দ্ধি।

বেগাবেগা—কোম বিষয় শীঘ্র আয়ত্ত হয় তবে খুব শীঘ্রই মন হতে মুছে যায়, এটা তৃতীয় স্তরের বুদ্ধি।

চিরাবেগা—বহুকাল ধরে কোন একটা জিনিস আয়ত্ত হয় কিন্তু দণ্ড দুই পরেই মন হতে সব মুছে যায়। এটাই সর্ব্বাধম বা সর্ব্বনিকৃষ্ট বুদ্ধি। তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের বুদ্ধি যাদের ঘারে ভর করে তারাই পদে পদে ঠকে, তাদের ঠকাটা পৌন-পুনিক হয়ে পড়ে।

বুদ্ধির দ্বিতীয় বিভাগ অনুসারে বুদ্ধি তিন প্রকার—উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা।

উত্তমা—বুদ্ধি যার সে পরের দেখে শেখে এবং সাবধান হয়। হরি সেদিন বেলতলা দিয়ে যাওয়ার তার মাথায় বেল-কাঁটা ফুট্‌ল। উত্তমা বুদ্ধিসম্পন্ন রাম ঐ ব্যাপার দেখে কোন দিনই বেলতলা দিয়ে গেল না।

মধ্যমা—বুদ্ধিসম্পন্ন যদু একদিন বেলতলা দিয়ে যাওয়ায় তার মাথায় বেলকাঁটা ফুটেছিল ; যদু বেল তলা দিয়ে আর কোনদিন গেল না।

অধমা—বুদ্ধিসম্পন্ন রাখাল দুবেলা বেল তলা দিয়ে যায়, মাথায় কাঁটা ফুটে, ঘা হয় তবুও যায় ; হয় ওবেলার কথা এবেলায় ভুলে যায় না হয় বিদ্‌খুটে অধমা বুদ্ধির দোষ।

বহু লোক এই অধমা বুদ্ধি ধরে চলে বলে আজ ধরার বুকে রৌরব নরকের খেলা চল্‌ছে।

বুদ্ধির তৃতীয় বিভাগ হলো (১) সাধারণ বুদ্ধি ও (২) চাঁই

বুদ্ধি। জগতের বেশীর ভাগ লোকেই সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে চলে; তাদের সূর্য্য পূবে ওঠে পশ্চিমে ডোবে, তাদের আম গাছে আম ফলে, জাম গাছে জাম ফলে, তেঁতুল গাছে তেঁতুলই ফলে, আম কাঁঠাল ফলে না। তাদের পলাস গাছে রংদার গন্ধহীন পলাশ ফুটে, চাঁপা গাছে উগ্রগন্ধ মধুহীন চাঁপা ফুল ফোটে। তারা সংসার ধর্ম্ম করে, চাষ করে, বাণিজ্য করে, উকীল, মোক্তার ডাক্তারের ব্যবসা করে, গ্রাম্য চৌকিদারী হ'তে হাইকোর্টের জজিয়তি পর্য্যন্ত চাকরী করে। তারা ভাব করে ঝগড়া করে, বন্ধুর বিপদে প্রাণ দেয়, আততায়ীকে হাসতে হাসতে সহিংস ছোরায় প্রাণে মারে; তাদের হাতে অহিংস ছোরার ঠাঁই নাই, তাদের মুখে ও মনে অহিংস নামের ছলনায় বহু প্রকারের দুষ্ট বুদ্ধি বাসা বাঁধে না।

চাঁই বুদ্ধি অপরূপ জিনিস - চাঁইগণ অদ্ভুত জীব। তারা নবদ্বারে তুলা এঁটে রাখে; পাছে এক ফোঁটা বুদ্ধিরও অপচয় হয়—মাত্র কাজের সময় তূলা খুলে বুদ্ধি বার করে কাজে লাগায়। যখন চাঁই বুদ্ধি বেরোয় তখন দুনিয়ার সব লোকের তাক লেগে যায়। ক্ষুদ্র শিশু খুঁটি আঁকড়ে থাকা কালে তার মা তার অঞ্জলিবদ্ধ হাতে কয়টি পিঠে দিয়েছিল। শিশু বহু চেষ্টাতেও পিঠে ও মুখের সংযোগ সাধন করতে না পেরে কাঁদতে লাগ্ল। এক সাধারণ বুদ্ধি মানুষ বল্‌লে ছেলের হাত হ'তে পিঠে কয়টা নিয়ে তার হাত দুটোকে খোলসা করলেই সব গোল মিটে যায়; মা বললে পিঠে যখন ছেলের

হাতে দিয়েছি তখন সে পিঠে ফিরে নেওয়া চলবে না—দত্তা-পহরণরূপ মহাপাপ হবে। তখন খুঁটি কাটার কথা উঠল। খুঁটি কাট্‌লে ঘর পড়ে যায় গৃহস্বামী তাতে রাজি হলো না। তখন চাঁই মশায়কে ডাকা হলো। চাঁই মশায় এসে নবদ্বারের তূলো খুলে বুদ্ধি বার করে বুক ফুলিয়ে বল্‌লে—

যেখানে নাই চাঁই সেখানেতেই ভুড়ুর ভাঁই।
ছেলেটা কাট্‌লে খুঁটিটা বাঁচে এ বুদ্ধিও নাই॥

তখন কেউবা ছোটে আঁশ বঁটি আন্‌তে ছেলেটাকে কাটার জন্যে—কেউবা তাতে বাধা দেয়। খুঁটি বাঁচুক আর নাই বাঁচুক হাঙ্গামা বাধে ; ছেলেদের বাপ খুড়ারা কেউ কেউ কাটা যায়। দেখছ তো ভাই সকল, বুদ্ধি নিয়ে বড়ই মুস্কিল। ওটাকে মাঝে মাঝে সানলাইট সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে না রাখলে নবদ্বার আঁটবার জন্যে তূলো খুঁজে ফিরতে হবে।

৬। কবির লড়াই

আজ সকালেই হারাধন ভায়া এসে হাজির। আজ তার দেহ মনে একটা উৎফুল্লতার ভাব—মাঝে মাঝে গুন গুন করে কি একটা গানের কলি ভাঁজছে। এসেই হারাধন বল্‌লে, "কি ভাই, চা কি হয়ে গেছে?" আমি বললাম, "না হয় নাই, হচ্ছে।" "আমার জন্যও এক কাপ চা আন্‌তে বল।" বলেই

আমার অপেক্ষা না রেখেই ডাক দিলে, "কেষ্ট, আমার জন্যেও এক কাপ চা আনিস্।" কেষ্ট শুধু আমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য নয়, সে আমার সারথি, আমার চর, আমার মন্ত্রী; বন্ধুদের অবিবেচিত অত্যাচার হতে সে আমার রক্ষক। "যা কিছু হারায় গৃহিণী বলেন কেষ্টা বেটাই চোর"—কথাটা আমার কেষ্টার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হবার কখনই অবসর পায় নহে। কেষ্টা দুকাপ চা আর আমার চায়ের চাট--টোষ্ট কখানা সমভাগে দুটি প্লেটে ভাগ করে নিয়ে এল। চা খেতে খেতেই হারাধন "কেষ্টা, একটা ডবল এডিসন কল্‌কে আন্" বলেই নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল।

থাকতে না পেরে বললাম, "আজ ভাই এত স্ফূর্ত্তি কিসের?" হারাধন বল্‌লে, "আজ কবির লড়াই-এর কথা ভাবতে ভাবতে মনটা আনন্দে নেচে উঠেছে।" আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, "কবির লড়াই! বিশ্বকবি স্বর্গবাসী হয়েছেন, কে লড়াই করবে?" হারাধন বল্‌লে, "এ তো মহাকবিদের কথা নয়—এ সেই পুরাতন আমলের কবির লড়াই। তুমি কি দেশের খবর রাখ না? জান না কি বাংলা দেশের মুখে কবিতাসুধা না থাকলে সে বাঁচে না। জয়দেবের অপূর্ব্ব ঝঙ্কারের পরেই চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির মধু হতেও মধুরতর পদাবলী-স্রোত বাংলার বুকে নেচে বহে দেশটাকে সরস ও আনন্দপূর্ণ করে তুলেছিল। যখন বৈষ্ণব কবিদের প্রতিভাস্রোতে ভাটা পড়তে শুরু হলো তখন চামর দুলিয়ে খোল করতাল

বাজিয়ে এলো মঙ্গলকাব্য রচয়িতার দল; তখনও দেশে মানুষ ছিল, মনুষ্যত্বের আদর্শও উঁচু ছিল আর ছিল আনন্দ। যখন ঐ স্রোতেও বালুচর জমতে শুরু করল তখন কবি-তরজা-পাঁচালীকারেরা ঢোলক ও বাঁয়া নিয়ে আসর জমালে। যদিও তাদের ছড়ায় গানে শ্লীলতা খুবই ক্ষুণ্ণ হলো তবুও তাদের উদ্দাম অঙ্গ-ভঙ্গী শ্লীলতাহীন রসিকতায় বাংলার উপর দিয়ে বহে গেল একটা মাতালে আনন্দ, একটা প্রাণখোলা হো হো হাসি—সে হাসির অভাবে বাংলা দেশ ও বাঙ্গালী হিন্দু মরণের কোলে লুটিয়ে পড়ছে।

"একশ বছর পূর্ব্বে বুলবুলির লড়াই, মেড়ার লড়াই, কবির লড়াই পাঁচলী গান প্রভৃতিই বাঙ্গলার বড়লোকদের চিত্ত-বিনোদনের ক্ষেত্র ছিল। একজন অধিকারী আর তার বায়েন, দুহার, ঢোলকী প্রভৃতি আট দশ জন লোক নিয়ে এক-একটা কবির দল হতো। দলগুলো অধিকারীদের নামেই বিকাত। অধিকারীগণ সহজ প্রতিভার অধিকারী ছিল; সঙ্গে সঙ্গে গান রচে গাওয়াই ছিল তাদের কার্য্য। হরু ঠাকুর (হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী), এণ্টনী, ফিরিঙ্গী, ভোলা ময়রা প্রভৃতি অধিকারীদের উচ্চধরণের কবি-প্রতিভা ছিল এবং খুব নামডাকও ছিল। মফস্বঃলেও অনেক নামজাদা কবির দল ছিল। খড়দহ অঞ্চলে জরের দল ও লকোর দল খুব নামজাদা ছিল। জরের দলের অধিকারী ছিল জরিলাল পণ্ডিত আর লকোর দলের অধিকারী লক্ষ্মীকান্ত খাঁ।"

আমি বল্‌লাম, "পণ্ডিত কি কবির দল করে?" হারাধন খাপ্পা হয়ে বল্‌লে, "তুমি কি ধোবীকা কুত্তা ঘাটের নও ঘরের নও সাহেব হতে পার নাই বাঙ্গালীও থাকতে পার নাই! তুমি কি কিছুদিন স্বেচ্ছাসেবক সেজে দেশের কাজের নামে নিজের পেটের কাজ চালিয়েছিলে? সবাই জানে যারা ঐরূপ করে তাদের মাথাগুলো ঘোলাটে মেরে যায়—দৃষ্টান্ত দেখতে চাও আঁদাড়ে পাঁতাড়ে দেখতে পাবে। আরে এ পণ্ডিত সদসৎ বিবেচনাশক্তিসম্পন্ন মানুষ নয়, এ পণ্ডিত পদ্ধতি বা পদবী। রমাই পণ্ডিতের বংশধর হাজার হাজার পণ্ডিত রয়েছে যাদের পেটে ডুবুরী নামিয়ে দিলেও একটা ক-অক্ষর উদ্ধার হবে না; এরা পণ্ডিতমূর্খ।

যাক্ এখন জরে-লকোর কবির লড়াইয়ের কথাই বলি।

খড়দহের এক বড়লোকের ঘরে একবার জরে-লকোর কবির লড়াই হয়েছিল। বাঁশের মেরাপ বেঁধে চাঁদোয়া খাটিয়ে আসর তৈরী হলো। মেরাপের একধারে বাঁশে টাঙ্গিয়ে দেওয়া একটা থলিতে কয়টা টাকা, আর এক ধারের বাঁশে আটটা পাকাকলা। উদ্দেশ্য, যে জয়ী হবে সে নেবে টাকার থলি, আর যে হারবে তাকে অষ্টরম্ভা খেতে বাধ্য করা হবে।

জরে-লকো তাদের সেরা কেরামতি দেখিয়ে লড়াই চালাল পুরো দুদিন ধরে; তবুও হার-জিতের কোন মীমাংসাই হোল না; বাবুদের বাড়ীর তরুণেরা তৃতীয় দিন প্রাতে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে দেখলে নৌকায় চড়ে বৈরাগীর দল কোথায় কবি-

গাইতে চলেছে। বৈরাগীর খুব নাম ডাক ছিল, তার উপর হারজিত নির্ণয়ে সে ছিল পাকা ওস্তাদ, হুনুরী জহুরী। তরুণেরা অনুরোধ করে বৈরাগীকে আনলে জরে-লকোর হারজিতের রায় দেবার জন্যে।

কবির লড়াই চল্‌লো, বৈরাগী গুণ-বিচারি একমনে শুনে চল্‌লো। অনেকক্ষণ পরে সবাই বললে, "বৈরাগী মশাই লড়াই খুব দীর্ঘ হয়েছে, এবার তোমার রায় দাও।" বৈরাগী পাকালোক, দেখলে সাদা কথায় হারজিতের রায় দিলে একটা গণ্ডগোল বাধবে ; তাই সে দাঁড়িয়ে উঠে হাত পা নেড়ে গান ধরলে,—

বিদেশী বৈারাগী আমি, কাজ কি আমার বিবাদে
জরের কান লকো মলুক, আমি দাঁড়িয়ে দেখি তফাতে॥

চারিদিকে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। লকো যখন কান মলছে তখন তারই জিৎ, আর জরের যখন কান মলা যাচ্ছে তখন তারই হার সাব্যস্ত হলো। লকোকে টাকার থলি দেওয়া হলো আর অশ্রুবিকল জরেকে অষ্টরম্ভা উদরস্থ করতে বাধ্য করা হলো।

আমার আনন্দ এই জন্যে যে কালের চাকার আবর্ত্তনে বোধ হয় আবার কবির লড়াই শুরু হলো তাই আমি বৈরাগীর ঐ রায়টাই গুন গুন করে গাইছিলাম।"

৭। বাঁকমল

ভাইসকল, অনেক দিন আগে বাঁকমল যখন বিলুপ্তির পথে দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছিল তখনও দু-এক জোড়া আল্‌তাপরা চরণ কমলে মাঝে মাঝে বাঁকমলের দর্শন মিলত। এখন রাঙা পায়ে বাঁকমল ডুমুরের ফুলের মতই দুর্লভ হয়েছে। সাঁওতাল রমণীদের গিরিচূর্ণ করা চরণে এখনও বাঁকমলের চলন আছে; মাঝে মাঝে বাঁকমল পরার বিষম সংবাদগুলোও নানা রংএ রঙ্গীন হয়ে জনলোকে বিসর্পিত হয়। একবারের এক গোচরীভূত ঘটনার কথা বলি।

সাঁওতাল পরগণার জামতড়া মহকুমায় কালীপুর বলে একটি গ্রাম ছিল, হয়ত এখনও আছে। গ্রামটী নিরবচ্ছিন্ন সাঁওতাল পল্লী,—সে গ্রামে অন্য কোন জাতিরই বসতি ছিল না। বড়কা মাঝি ছিল প্রধান—তার সহকারী ছিল কয়জন মণ্ডল মাঝি। বড়কার সভাপতিত্বে মণ্ডলগণের সহযোগিতায় মাঝে লাঝে সভা ডাকা হতো। সে সব সভায় গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার উপস্থিত থাকায় কোন বাধা ছিল না; কোন কনষ্টেবল বা সভারক্ষক স্বেচ্ছাসেবক দর্শকদের বেত্রাঘাত করে বা ধাক্কা দিয়ে বিতাড়িত করত না। ঐ সব সভায় চুরি, ব্যাভিচার, পত্নীত্যাগ প্রভৃতি বৈষয়িক ও সামাজিক বিরোধের বিচার হতো। নিরক্ষর হলেও তাদের বিচার অনেক সময়েই উঁচু আদালতে উঁচুপদের শিক্ষাপ্রাপ্ত বিচারক-

দের চাইতে অধিক ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গতই হতো; কারণ তাদের বিচারগুলো গোপন আদেশ, পদোন্নতির আশা, বিদ্বেষ, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি স্বার্থ-পুটুলীর ভারে বেঁকে যেয়ে একপেশে হতো না।

সাঁওতাল সমাজে বড়কার আসনটা বেশ উচু ছিল। সেটা বেতন বৃদ্ধি, উপরের টান, নীচের ঠেলা প্রভৃতি আঁধারে কারণে উচু ছিল না; সেটা হক বিচার, ন্যায় নিষ্ঠা, ধর্ম্মলক্ষ্য প্রভৃতির জন্য শ্রদ্ধা-প্রীতির খুঁটোর জোরেই উচু ছিল। বড়কার একমাত্র কন্যা-সন্তান নানকী সকলেরই আদেরের বস্তু ছিল। তার যখন পনের ষোল বছর বয়স হলো তখন কাছের দূরের অনেক গ্রামের গ্রামপ্রধানদের কাছ হতে নানকীর বিবাহের প্রস্তাব আসতে শুরু করলে। নানকীর স্বাস্থ্যে ভরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর সরল আনন্দ উছল চোখ মুখ অনেকেরই খুব ভাল লাগত। অনেক গ্রামপ্রধানদের তরুণ পুত্রেরা উৎসব উপলক্ষে মাদল কাঁধে কালীপুরে এসে মেঝান-দের নাচালো আর নিজেরাও নাচ্‌ল। দুএক জনের সঙ্গে নানকীর হাসিমুখের দুএকটা কথাও হলো।

বড়কার মা একদিন বড়কাকে বল্‌লে, "বেটা, দেখছিস্‌ ত নানকীর বিয়ার বয়েস হইছে—দুচার জন ভাল বরের বাপও কথা পাড়ছে। কোন দিন বিয়ার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। বাঁকমল না পরালে ত আমাদের মেয়েদের বিয়া হয় না; তুই নানকীর বাঁকমল পরাবার সব ঠিক করে দে।" মায়ের কথা

শুনে যারা বাঁকমল পরাবার ওস্তাদ বড়কা তাদের ডাকলে ; হড়কু, ছেদন, রামু, লখু সব এলো। সব কথা শুনে তারা একজোড়া পোক্ত গোছের বাঁকমল আনলে। নানকীর পা দুটো ঠিক পাথর চুর করা ছিল না, কিছু নরমই ছিল। তবুও সরষের তেল দিয়ে পা দুটো অনেক দলাই মলাই করে বাঁকমল পরাতে শুরু করলে। পায়ের ও মলের কোনরূপ মিল আছে কি না সেদিকে লক্ষ্য নাই, অবস্থা বা দেশকালের বিচার নাই, গোঁয়ার আত্মম্ভরী ওস্তাদগণ শুধু খেয়ালের বশে গায়ের জোরে মল পারাতে শুরু করে দিলে। নানকীর কোন কথাই শুনলে না, তার আকূল কাতরতাও লক্ষ্য করলে না ; ফলে নানকীর গোড়ালীর কাছের হাড় ভেঙ্গে গেল—পা ফুলে উঠল, জ্বর হলো, সে শয্যা নিলে। অনেক জড়িবুটি লাগিয়ে ফুলো কম্‌লো জ্বরও সারল—তবে নানকী চিরকালের জন্য খোঁড়া হয়ে গেল। যেমন করে আজকের ভারতের গাঁয়ে মানেনা আপনি-মোড়ল নেতাদের অনেকে দেশবাসীর অন্নবস্ত্র প্রভৃতির অভাবে শতবিধ অনাচার অধর্ম্মের তাড়নার জন্য মিছে কথা ছলনা দিয়ে নিজেদের বাহাদুরির ডঙ্কা পিটে চলেছে, বাঁকমল পরারও ওস্তাদগণও ঠিক তেমনি করে জোর গলায় নিজেদের বাহাদুরী জাহির করতে লাগল। নানকী মাটিতে পড়ে বড়াং ঠাকুরের কাছে মলপরান ওস্তাদদের নির্ব্বংশত্ব ও বিলুপ্তির প্রার্থনাই করতে লাগল। বড়কার মা বুড়ী একদিন নাতিন নানকীকে বল্‌লে, “এখন মল পরান

ওস্তাদদের শাপমন্যি করে কি হবে? তাতে কি তোর খোঁড়া পা সারবে? যখন ঐ হতভাগারা বেহিসেবী করে বেকাদায় তোকে মল পরিয়েছিল তখন তাদের মুখে লাথি মেরে দূর করে দিলি না কেন, তাহলে ত আজ এই নরক ভোগান্তি ভুগতে হতো না। যা হবার হয়েছে—এখন আগের দিনের জন্যে হুসিয়ার হ”।

৮। অসম্ভব

বহুকাল পূর্ব্বে কোন কবি এক উদ্ভট শ্লোক রচনা করে অসম্ভবের একটা রূপ এঁকেছিলেন। সেই শ্লোকটা আজ হামেসাই মনে পড়ছে; কারণ আজ সব ঠাঁই বর্ষাকালের বেঙের ছাতার মত অসম্ভবটাই মাটি ফুঁড়ে ফুটে উঠছে। ছোট বড় সবারই চেষ্টা ঐ পথ ধরেই চলেছে; ছাগল দিয়ে যব মাড়াবার, বানর দিয়ে সঙ্গীত গাহাবার, জলে শিলা ভাসাবার চেষ্টাই চলেছে। যে শ্লোকটার কথা বল্‌ছিলাম সেটা এই,—

বন্ধ্যাপুত্রো রণে যাতি খপুষ্পমালিকাধরঃ।
কূর্ম্মলোমপটাবৃতো ফেরুশৃঙ্গশরাসনঃ॥

বন্ধ্যার পুত্র অসম্ভব, পুত্র জন্মিলেই নারীর বন্ধ্যাত্ব চলে যায়। এ বীর কিন্তু বন্ধ্যাপুত্র; তিনি যুদ্ধ করতে চলেছেন। যুদ্ধকামী বা যুযুধান বীরের গলদেশ পুষ্পমাল্যে শোভিত

করার একটা প্রথা আছে ; বন্ধ্যাপুত্র বীরের গলায় যে ফুলের মালা শোভা পাচ্ছে সেটা আকাশকুসুমে রচিত অর্থাৎ অসম্ভব। যোদ্ধার বসন সজ্জার আবশ্যক ; বাস্তব বীরগণের বসন হয় তূলার নয় রেশমের নয় পশমের। পশম, ছাগলোম বা ভেড়ার লোম ; ছাগ লোমে হয় শাল বনাত প্রভৃতি আর ভেড়ার লোমে হয় আলপাকা মেরুণো প্রভৃতি। বাস্তব বীরগণ ঐ সব বসনের পোষাকেই ব্যবহার করে, বন্ধ্যাপুত্র রূপ অসম্ভব বীরের ত ওসব বসনের পোষাক চলে না ; সাধারণের পাঁজে পাঁজ মিলিয়ে চল্‌লে যে তার অসম্ভবত্ব অসাধারণত্ব ঘুচে যায়, তাই কুর্ম্ম বা কাছিমের লোমের তৈরী বসনে তার দেহটি আবৃত। অসম্ভব কুর্ম্মলোমের সঙ্গে অসম্ভব বন্ধ্যাপুত্রের মিলন ঠিকই হয়েছে। বীরের অস্ত্র থাকা চাই। অতীতে ধনুই ছিল প্রধান অস্ত্র ; কাজেই বন্ধ্যাপুত্র ধনুর্ধারী। ধনু হতো বাঁশের বা অন্য কোন নমনীয় বৃক্ষ-কাণ্ডের, শৃঙ্গেরও ধনু হতো। খুব বলবানেরাই শৃঙ্গনির্ম্মিত ধনু ব্যবহার করতে পারত। শ্রীকৃষ্ণের ধনুটি ছিল শৃঙ্গনির্ম্মিত বা সার্ঙ্গ এবং সেজন্যে তাঁর নাম শার্ঙ্গধর। বন্ধ্যাপুত্ররূপ অসম্ভব বীরও শার্ঙ্গধর তবে সেটা গোমহিষাদির শৃঙ্গে নির্ম্মিত নয়, সেটা শৃগালের শৃঙ্গে নির্ম্মিত ; আশা করি শৃগালের শৃঙ্গ যে কি জিনিস তা আমাদের খুবই জানা আছে।

যারা অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলবার চেষ্টায় প্রাণপাত করে ; যারা অসম্ভব-রূপ মরীচিকার জলে তৃষ্ণা নিবারণের

জন্যে জীবন মরুভূমির উপর ছুটে বেড়ায়, তপ্ত বালির উপর পড়ে জল জল বলে চীৎকার করতে করতে মরণালিঙ্গনই তাদের নিষ্করুণ বিধিলিপি। আজ আমাদের সবারই ঐ দশা, আমরা সবাই মরীচিকার পাছে ছুট্‌তে ছুট্‌তে শুষ্ককণ্ঠ ও ওষ্ঠাগত প্রাণ; বাকী শুধু তপ্ত বালির উপর পড়ে জল জল করতে করতে মরণালিঙ্গন।

একদিন ছিল, যখম বুড়ার আদর ছিল; মুমূর্ষু পুত্রকে তেমাথার যুক্তি নিয়ে চল্‌বার উপদেশ দিতেন। বেশী হ'লে জরাজীর্ণ বৃদ্ধেরা দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে যখন রোদ পোহায় তখন তেমাথাই মনে হয়, তাই তেমাথা মানে অতিবৃদ্ধ। এখন ত ভাই আর সে দিন নাই; এখন বুড়া back number, বুড়া বেকুফ্, তার অভিজ্ঞতা অশ্রাব্য, অগ্রাহ্য। তবুও আমার অভিজ্ঞতার দুচারটে কথা আমার তরুণ ভাইদিগকে না শোনালে যে আমার জীবনটাই ব্যর্থ হবে, মরেও সুখ পাব না; কাজেই দুচারটে কথা বলতেই হলো। তবে প্রচুররূপে বেশী অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পথে বাধা দেব না বরং সেজন্য তোমাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতাই দিচ্ছি আর পূর্ণ স্বাধীনতা যে কি মেওয়া চীজ এই ক'বছরে অন্য সব রামরাজ্যবাসীদের সঙ্গে তোমরাও ত তার পূরা সোয়াদ পেয়েছ।

আমার অভিজ্ঞতার কথা :—

১। অহি-নকুল, মুষিক-মার্জ্জার, ব্যাঘ্র-বলদ, তেল-জল,

জল-আগুন, প্রভৃতি প্রকৃতিবিরুদ্ধ বস্তুর মধ্যে মিলন অসম্ভব। তাদের মধ্যে মিলনের চেষ্টা করলে অঘটনই ঘট্‌বে।

২। যারা কোন সমাজভুক্তই নয়; যারা ইংরাজও নয়, মুসলমানও নয়, হিন্দুও নয় অথচ এই সকলের মিশ্রিত কিম্ভুত কিমাকার জীব বলে নিজেদের প্রচার করে বেড়ায় তাদের দ্বারা কোন ভাল কাজ হওয়া অসম্ভব; কাজ অপেক্ষা অকাজ, বিকাজ বা কুকাজেই তারা বিশেষ পটু।

৩। যারা কথাগুলোর কদর্থ ক'রে মানুষকে ভেল্কী-বাজীর ধাপ্পা দিয়ে চলে এবং নিজেদিকে বেশী চালাক মনে করে তাদের দ্বারা কোনও সৎ বা মঙ্গলকর কাজ সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।

৪। যারা দাসত্বের মোহে শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয় ক'রে বিবেক বুদ্ধিহীন পশুতে পরিণত হয়, যাদের মনগুলো হিংস্র বজ্জাতিতে ভরা তাদের ভিতর মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব।

৫। রুচির বৈচিত্র্যহেতু দুদল মানুষ যখন অহি-নকুলের মত প্রকৃতিবিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় তখন তাদের মিলন অসম্ভব।

৬। যে বহিঃ-প্রধান সে পঞ্চভৌতিক দেহটার তোয়া-জেই রত থাকে; ভাল খাদ্য, মত্ততাকর মদ্যাদি পানীয়, রমণী, নৃত্য গীত-বাদ্য, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতিতেই মত্ত থাকে; আর যে অন্তরপ্রধান সে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তরালে কে আছেন তাকে জানবার, তাঁর সঙ্গে যোগ স্থাপনের চেষ্টা

করে। ঐ দেহসর্ব্বস্বদের সঙ্গে আত্মসর্ব্বস্বদের যোগ বা মিলন অসম্ভব।

৭। যারা চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিষ্কল, অশরীরী বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসন করে আর যারা ভগবানকে ব্যক্তিরূপে, দেহীরূপে চিন্তা করে তাদের মধ্যে মিলন অসম্ভব।

ভাই সকল, আমি মোটে সাত রকমের অভিজ্ঞতার কথা বল্‌লাম। তোমরা বিচিত্র জীবন পথের নবীন পথিক, তোমরা শত সহস্র প্রকারের নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে জ্ঞানদীপ্ত ও বলদৃপ্ত হও এই কামনা করি এবং ঐ কামনা পূরণের জন্য শ্রীভগবানের কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

৯। ফুটি

বহুশত বৎসর পূর্ব্ব হতে ভারতে বসন্ত শেষে শিকারে যাওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। দশরথ বসন্ত শেষে বা গ্রীষ্মাগমে শিকারে গিয়েই হাতী ভুল করে শব্দভেদী বানে অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুকে বধ করেছিলেন। দুষ্মন্তও গ্রীষ্ম বিরলপত্র পাদপ সমাকুল বনভূমিতে শিকারে গিয়ে কুলপতি কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলা লাভ করেছিলেন। এখনও সঙ্গতি-সম্পন্ন অভিজাত শিকারীরা গ্রীষ্মাগমেই শিকারে গমন করেন

আর ভারতের আদিবাসী মুরা, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি নিসর্গ সন্তানগণ গ্রীষ্মাগমেই তাঁদের শিকারের অনুষ্ঠান করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কোন সময়ে ভারতের এক-জন করদ নৃপতি ব্রিটিশের পলিটিক্যাল এজেণ্টকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে গিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে লোক-লস্কর, হাতি ঘোড়া তাম্বু প্রভৃতি বৃহৎ আয়োজনই ছিল। শিকারে সাফল্য লাভ করে তাঁদের মনগুলোও বেশ আনন্দ উচ্ছলই ছিল। একদিন রাজা বাহাদুর ও এজেণ্ট সাহেব তাম্বুর মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর যখন ফলাহারে রত তখন কৌতূহলের বশে রাজা এজেণ্টকে বললেন, "আচ্ছা সাহেব আমাদের দেশের, কোন ফল আপনাদের খুব ভাল লাগে ?" এজেণ্ট মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করে বললেন, "ফুট্"। হিন্দী ভাষায় অনেক ই বা ঈ-কারান্ত শব্দ অকারন্তরূপে উচ্চারিত হয়। "রাজকুমারী" শব্দ "রাজকুঙার" রূপে, "সীতাপতি রঘুবর রাম" "সিয়াপত রঘুবর রাম" রূপে উচ্চারিত হয়, সেইরূপ ফুটিশব্দও ফুট-রূপে উচ্চারিত হয়। রাজা বাহাদুর সাহেবের কথায় বিস্মিত হয়ে বললেন, "সেকি ! যে দেশে লম্বা আঙ্গুর, বেদানা, সেও, লিচি, আপেল, নাসপাতি, ল্যাংড়া ফজলী, আল্ফানসো, কিষণভোগ, গোপালভোগ প্রভৃতি নানাজাতীয় আম, আতা, জামরুল, গোলাপজাম, কমলালেবু প্রভৃতি উপাদেয় ফল প্রচুর জন্মে সে দেশের ফলের মধ্যে অতি নগন্য ফুটি বা ফুটই আপনাদের

ভাল লাগে এতে তাজ্জব লাগে।"। তখন এজেণ্ট সাহেব মৃদু হেসে বললে, "রাজা বাহাদুর আমি সোমক বা কাঁকুড় ফুটির কথা বলছি না, ফুট্-faction বা dissension-এর কথা; যে ফল খেয়ে, যে ফলের জোরে আমরা এদেশে টিঁকে আছি, বেঁচে আছি সেই ফুটের কথাই বলছি।"

সত্যইত ফুট বা ফুটিতেই ত বরাবর আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে! কত ফুটিই যে ফেটেছে আমাদের দেশে তার ইয়ত্তা নাই, আলেকজান্দারের সময়ের ফুটি তক্ষশিলারাজ, সাহাবুদ্দিনের সময়ে ফুটি জয়চাঁদ, মোগল রাজপুতের দ্বন্দ্বে ফুটি মানসিং, সিরাজ-ইংরাজের দ্বন্দ্বে ফুটি মীরজাফর-উমিচাঁদ, শিখ-ইংরাজের দ্বন্দ্বে ফুটি গোলাপ সিং। ইংরাজের কিঞ্চিদধিক দেড়শত বছরের শাসন ও শোষণের সময়ে ভারতের আঁদাড়ে পাঁদাড়ে কত ফুটিই যে তাদের দুর্গন্ধ ছুটিয়ে ফেটেছে তা গুণে শেষ করা যায় না। আস্ফালন জয়ঢাকের কান ঝালাপালা-করা বেজায় আওয়াজে জাহিরীকৃত আমাদের স্বাধীনতার প্রথম তিন বছরে কত ফুটিই যে ফেটেছে তা খোদাকেই মালুম—আর যাদের চোখ আছে তারাও কিছু কিছু জানে কেউ বলে তিন চার লাখ, কেউ বলে তিন চার কোটি।

ঐ সকল ফাটা ফুটির তরল স্রাব আর মাছি ভন-ভনানি সহ্য করেও দেশটা সসেমীরা করে কোনরূপে বেঁচে ছিল; কিন্তু আজ এ আবার কি বিপদ! আবার কি জীগিষু, অরি, মিত্র, অরেমিত্র, মিত্র-মিত্র, অরেমিত্র মিত্র, মিত্র-মিত্র-মিত্র, মধ্যস্থ,

উদাসীনের দ্বন্দ্ব বিরোধে দেশটা উচ্ছন্ন হবে ? আজ শান্তিপ্রিয় দেশমঙ্গলকামীর মন যে আতঙ্কে জড়-সড়। আত্মম্ভরী পর-বিষয়ে বিজ্ঞ নেতার দল যে তাহলে ন্যাতায় পরিণত হবে ! গোবর জল না হলে শুধু ন্যাতা বুলিয়ে কি মাছি ভন্‌ভনানি নিবারণ করা যাবে ? শেষে মাছির জ্বালায় দেশটা কি উজাড় হবে ! হায়, হায়, কেন এমন হলো ? কেন কংগ্রেসের আজ এ দুর্দ্দশা ? সুরেন্দ্রনাথ আনন্দমোহনের কংগ্রেস, উমেশচন্দ্র ওয়েডারবর্ণ-এর কংগ্রেস, মেটা-ওয়াচার কংগ্রেস, লাল-বাল-পালের কংগ্রেস, চিত্তরঞ্জন মতিলালের কংগ্রেস, গোখেল ভূপেন্দ্রনাথের কংগ্রেস, তিলক গান্ধীজীর কংগ্রেস আজ এমন ফাটাফুটি হলো কেন ? কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাগণ ভারতে ঐক্য স্থাপনের মন্ত্রের উপরেই-ত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরা যে শ্রীশ্রীচণ্ডীর বাণী প্রাণে অনুভব করেছিলেন, তাঁরা যে বুঝেছিলেন দেশবাসী সকলের শক্তি ঐক্য লাভ না করলে যে মহিষমর্দ্দিনী মহাশক্তির আবির্ভাব হবে না।

ততো হি কোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগস্থতঃ॥

সেই 'ঐক্যং সমগস্থতঃ সুমহৎ তেজা'ই ত দশভুজা মহিষ-মর্দ্দিনীতে পরিণত হয়।

মনটা হতাশায় আতঙ্কে ভেঙ্গে পড়ল ; অকূল পাথার

ভাবতে লাগলাম ; কোনই কূল কিনারা পেলাম না। এমন সময়ে হারাধন ভায়া এসে হাজির। তাকে সব কথা বলায় সে হেসে উঠে বল্‌লে, "এ যে বাইবেলের আদি পাপেরই মত আমাদের সব কাজে বিরোধ-বিতণ্ডার স্রষ্টা গান্ধর্ব্বাস্ত্রের প্রেতাত্মা।" আমি বললাম, "সে কি ?" হারাধন বল্‌লে, "জান না ? শোন। বিরাট রাজ যখন দূর দেশে ত্রিগর্ত্ত দেশের (তিব্বতের ?) রাজা সুশর্ম্মার সঙ্গে যুদ্ধরত তখন দুরন্ত কৌরবগণ উত্তর গোগৃহের গোরুগুলি হরণ করবার মৎলবে বিরাটের রাজ্যে হানা দিলে। বীরেরা কেউ নাই, বহু সৈন্যসহায় দুরন্ত কৌরবদের কাছ হতে কে গোধন রক্ষা করবে ভেবে রাজ-পরিজন হতাশ হলো। অজ্ঞান বালক উত্তর কেবলই বল্‌তে লাগল, "আমি একজন সারথি পেলে একরথে কৌরব হানাদারদিগকে টিট্ করে দিতে পারি।" সৈরিন্ধ্রীবেশিনী দ্রৌপদীর ইঙ্গিতে বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুন যখন সারথিত্ব করতে রাজী হলেন, তখন বৃহন্নলাকে সারথি করে উত্তর একরথে কৌরব হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলে। গোগৃহের কাছে পৌঁছে কৌরবদের বিপুল সৈন্য সমাবেশ দেখে উত্তর এত বেশী ভয়বিহ্বল হলো যে পালাবার উদ্দেশ্যে বৃহন্নলাকে বারম্বার রথ ফিরাতে বল্‌লে। বৃহন্নলা বল্‌লে, 'যুদ্ধ করতে এসে ফিরে পালান আমার ধাতে সয় না ; লড়াই করে গোধন রক্ষা করতেই হবে।' উত্তর তখন পালাবার মৎলবে রথ হতে লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করলে। অর্জ্জুন বা বৃহন্নলা তখন

উত্তরকে ধরে তারই পাগড়ীর কাপড় দিয়ে তাকে রথে বেঁধে রাখলেন আর পা দিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে রথ চালাতে আর দুহাতে ধনুর্ব্বান ধরে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। একজনই রথিত্ব ও সারথিত্ব করছে আর এক-একটা করে বহু সৈন্য বধ হচ্ছে দেখে বৃহন্নলাকে অজ্ঞাতবাসী অর্জ্জুন বলে কেউ কেউ সন্দেহ করলে এবং তাতে তাদের আতঙ্ক ও ভয় জন্মাল। মহামনা অর্জ্জুন ভাবলেন, যখন এসেছি তখন বিরাটের গোধন রক্ষা ত হবেই,—অকারণ ভীত আতঙ্কগ্রস্ত জ্ঞাতিবধ করি কেন? এই ভেবে তিনি একটি গান্ধর্ব্বাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন; অস্ত্রটিতে অনেকটুকু "চাঁইবুদ্ধি" মাখান ছিল। ঐ অস্ত্রের গুণে কৌরবগণ পরস্পরে মারামারি করে অজ্ঞান হয়ে ভূমিশায়ী হলো। বিরাটের গোধন রক্ষা হলো আর যে কৌরব-সেনারাও দুচারজন মরেছিল তারা বাদে সব হস্তিনাপুরে ফিরে গেল। কেউ কেউ বলে অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত চাঁইবুদ্ধি মাখান ঐ গান্ধর্ব্বাস্ত্রটা পুরা খোরাক না পাওয়ায় তার প্রেতাত্মাটা ক্ষুধিত হাহাকারে আজও ভারতের আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর স্বার্থসর্ব্বস্ব বিদ্বেষ বিরোধের ফুটি ফাটাচ্ছে। এ আপদ হতে ভারত কিসে রক্ষা পাবে বুঝতে পারি না।"

আমি বল্লাম, "ঐ সর্ব্বনাশা প্রেতাত্মাটার গয়ায় পিণ্ড দিলেই ত সব ল্যাঠা চুকে যায়।" হারাধন বল্লে, "তাহলে ত প্রেতাত্মাটারও উদ্ধার হয়, দেশেও শান্তি ফিরে আসে; কিন্তু পিণ্ড দেবে কে? হিন্দু মানসিকতা না হলে ত পিণ্ডদান হয়

না। যারা গদাধরের মাথায় গদা প্রহারের জন্য তাদের দুর্ব্বল কোমরগুলোকে নিধিরাম সর্দ্দারের মত জোর করে ফস্‌কা গিরে দিয়ে বেঁধে উঠে-পড়ে লেগেছে তারা গদাধর পাদপদ্মে পিণ্ডদান করবে কেন? যারা জড়শিকড় সমেত অক্ষয় বটকে তুলে জ্বালানির জন্যে পাকিস্তানে চালান করতে চায় তারা অক্ষয় বটের তলায় পিণ্ড দিতে যাবে কেন? তারা দেশটাকে দীনিয়া করতে পারলেই চতুর্ব্বর্গ লাভ করবে। চাঁইবুদ্ধিতে মশগুল তাদের দ্বারা বিরোধ-বিদ্বেষের পিণ্ড-দানের দেশে ঐক্যস্থাপনের, শান্তিবারি সিঞ্চনের, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনের আশা বেবাক অসম্ভব, বিলকুল ঝুটা। যদি দেশবাসী এখনও সাবধান হয়ে আপনার গোণ্ডা বুঝে নেবার চেষ্টা করে তবেই বাঁচাও—তা না হলে দেশের সঙ্গে দেশবাসীও লোপাট হবে—দেশ হবে দীনিয়া আর অমুসলমানদের 'অ'টা মুছে যাবে।

১০। পন্থা

কিছুদিন হতে দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার চিন্তায় হারাধন ভায়ার রাত্রে আদৌ ঘুম হয় না। তাই ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় দেহ মনকে কতকটা সুস্থ করবার মৎলবে ভায়া প্রায়ই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের আগেই লালদীঘি, গোলদীঘি প্রভৃতি সরোবরের ধারে

ঘুরে বেড়ায়। যেদিন সুযোগ সুবিধা হয় ভায়া বেড়ান শেষ করে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমার এখানে এসে উদয় হয়। আজ সেইরূপ একটা দিন; তুজনে বসবার ঘরে বসলাম; চা এলো, সংবাদপত্র এলো, কথাও চলতে থাকল; তবে সবই ফিকে, আলোচনা, প্রাণহীন মনে হলো। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে, রাজ্য আইনসভায় যে সব কেলেঙ্কারী কথা বেরুচ্ছে তাতে আমাদের মনগুলো নিমপাতার রসে সিক্ত হয়ে উঠেছে। না হয়ে পারে না, মানুষের মনে ন্যায়-ধর্ম্ম-বুদ্ধি এরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে অন্যায় অবিচার অত্যাচারের কথায় মনগুলো লাঙ্গুলে আহত সর্পের মত ফণা তুলে বিদ্রোহের ফোঁস ফোঁস ধ্বনি না তুলে পারে না। করের উপর নিষ্ঠুর ভাবে নিত্য নব নির্দ্ধারিত কর, পাষাণ হৃদয় রাজ কর্ম্মচারীদের নির্ম্মম কঠিন করে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন, শিক্ষাহীন, কঙ্কালসার অসহায় দরিদ্র জনগণের অস্থি মজ্জা চূর্ণ করে অশ্রুলিপ্ত নিঃশ্বাসতপ্ত যে টাকা আদায় হচ্ছে তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ভালমানুষী অর্জ্জনের আত্মীয় পোষণের যে বেহিসেবী খেয়াল চলেছে তাতে যে দেশটা শীগ্‌গিরই রসাতলে ডুববে তাতে সন্দেহ করবার কোনই কারণ দেখা যায় না।

রাবণ সদ্বংশজাত, মুনি-ঋষির রক্ত তার শিরায় বয়ে চলেছিল। শিক্ষাও খুব উচ্চ ধরণের ছিল; মুমুর্ষু রাবণের কাছে রাজনীতি শেখবার জন্যে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে পাঠিয়ে-

ছিলেন। সাধনাও উচ্চাঙ্গেরই ছিল; ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবতাগণ তাকে প্রায় অমরত্বেরই বর দিয়েছিলেন। পরদুঃখ অনুভবশীল উচ্চ মানসিকতাও তার ছিল; ত্রিতাপদগ্ধ জীবকে স্বর্গের সুশীতলতায় স্থাপনের উদ্দেশ্যে স্বর্গ পর্য্যন্ত সিঁড়ি রচনার কল্পনাও করেছিল, কিন্তু ঈশ্বরবিরোধী রাক্ষস প্রকৃতির বশে তার সে সবই বিফল হলো। যে দেবতাদের বরে রাবণ বরিষ্ঠ, শক্তিমদে মাতাল হয়ে সেই দেবতাদের বিরুদ্ধাচরণ করে শেষে রাক্ষস হয়ে পড়ল। রাক্ষসী আত্মম্ভরিতায় এরূপভাবে ভরে উঠল যে, যে লোক যুক্তি ও ধর্ম্মসঙ্গত হিতবাক্য বলে তারই নির্য্যাতন করতে লাগল; নিজের ভাই বিভীষণ তাকে ধর্ম্মসম্মত ন্যায়ানুগ কথা বলায় তাকে লাথি মেরে লঙ্কা হতে দূর করলে; ফল হলো লঙ্কা ধ্বংস এবং রাক্ষস বংশ নাশ; অতি দর্পের নিশ্চিত ফল ফলে গেল। মনে হয় আমাদের শাসকগণের অনেকেই আত্মম্ভরী রাবণের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চলেছে। তাদের অনেকেই সদ্বংশজাত, তাদের কারো কারো শিরায় উচ্চ কূলের রক্ত বইছে। শিক্ষা সাধনাও ভাল, তবে রাক্ষসী আত্মম্ভরিতায় সব নষ্ট হতে বসেছে। এত ধৃষ্ট, এত উদ্ধত যে হিতবাক্য শোনবার ধৈর্য্য ত নাইই; ইচ্ছা পর্য্যন্ত নাই। যে হিতবাক্য বলবে তারই নির্য্যাতনের ষড়যন্ত্র, দরকার হলে আইনগুলো বাঁকিয়ে ভেঙ্গে-চুরে, নিজেরা বিশ্ববাসীর হাস্যভাজন হয়েও হিতবাদীকে নির্য্যাতন করবে। যে ভোটার-দেবতাদের বরে

আজ অসীম শক্তি লাভ—শক্তির মত্ততায় আজ তাদের লাঞ্ছিত পদদলিত করবার বিপুল ষড়যন্ত্র চালিয়ে চলেছে ; ভুলে গেছে স্বেচ্ছাচারী জনমঙ্গল বিরোধী বেন রাজাকে প্রজারাই দোহন করেছিল। তাই ভয় হয় শেষ পর্য্যন্ত অনেকেরই বক্ষ-পঞ্জর ভেদ করে দীর্ঘশ্বাশের সঙ্গে বেরুবে, "আপনি মজিলি ভাই লঙ্কা মজাইলি।"

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে মনটা বিহ্বলতায়, উদ্‌-ভ্রান্তিতে ভরে উঠল। অসাড় মনের কার্য্যরূপে মুখে ফুট্‌ল, "ভাই হারাধন, বাঁচবার উপায় কি ? ভারত ত শুধু তোমার আমার নয়, এ যে সব শ্রেণীর ভারতবাসীর, ভারত ত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খ্রীষ্টান, মুসলমান সবারই জন্মভূমি, সবাইত ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির কামনাই করছে ; কারণ ঐশ্বর্য্য সম্পদপূর্ণ ভারত, সুখ শান্তি ভরা ভারত।

"হাস্যউছল ভারতই ত সকলের স্বার্থসম্মত, সকলের একমাত্র কাম্য। কংগ্রেসপন্থী; হিন্দু মহাসভাপন্থী, সমাজ-তন্ত্রপন্থী, স্বয়ংসেবকপন্থী, জনগণপন্থী, সবাই ত ভারতের মঙ্গল কামনাই করছে, উন্নতি কামনাই করছে। উদ্দেশ্য সকলের এক হলেও যত মত তত পথ, আর পথের ভিন্নতাতেই যত বিপদ। সবাই দেখি আপন আপন পথ ধরে চলেছে, গম্য কোথায় সেদিকে কারও লক্ষ্য নাই ; সবাই পথের বৈচিত্র্য নিয়েই গালাগালি মারামারিতে ব্যস্ত। সবাই যেন গম্যের পথ ছেড়ে আপন আপন দলের পথের গোলক ধাঁধার

মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাই হারাধন এখন উপায় কি? কোন পথ ঠিক?”

হারাধন চোখ মুদে কতক্ষণ চিন্তা করে বললে, “দাদা, ঠিক পথ নির্ণয় করার চেষ্টাই ত পৃথিবীতে মানব আবির্ভাবের প্রথম হতেই হয়ে আস্‌ছে। কোন কোন স্থানে ঠিক পথের সন্ধান মিলেছে বলেই অনেকে মনে করে। কিন্তু সে পথে চল্‌বার মানুষের অভাবই লক্ষিত হয়েছে। বৈদিক ঋষি কঠোর সাধনায় পথের সন্ধান পেয়ে বিশ্ববাসীকে ডাক দিয়ে বল্‌লেন,

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি
দিব্যানি তস্থু।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং
তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা
বিদ্যতেঽয়নায়॥

হে বিশ্ববাসীগণ, হে অমৃতের পুত্রগণ, হে জনগণ, যাঁরা দিব্যলোকসমূহে বাস করেন সকলে শুনুন, অন্ধকারের পরপারে আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষ রয়েছেন আমি তাঁকে জেনেছি, তাঁকে জেনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় অর্থাৎ অমরত্ব অর্থাৎ চিরসুখ লাভ করা যায়; চল্‌বার অন্য কোন পথ নাই। কিন্তু সবই ত দূরের কথা, বেশী লোকও সে পথে চল্‌তে পারলে না; তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুঃখ করে অর্জ্জুনকে বললেন—

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কচিৎ যততি সিদ্ধয়ে।

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে মাত্র এক আধজন সিদ্ধির পথ ধরে চলে। তাই ভগবান লাভ খুব কম লোকেরই হয়। ভগবন্মুখিতাও বর্ত্তমান সমাজে খুবই বিরল হয়ে পড়েছে। থাক্ ও কথা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীগণ, গুহাবাসী সহস্র সহস্র সিদ্ধ সাধকগণ, জৈন ত্যাগীগণ, চীন জাপান প্রভৃতি বহুদেশের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ, খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী-গণ, মুসলমান সাধক পীরগণ—এঁদের সকলের সিদ্ধি ঘটুক। আমরা সংসারী মানবেরই কথা আলোচনা করি। বকরূপী ধর্ম্ম যখন যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন, "কা চ পন্থা", তখন যুধিষ্ঠির বললেন,

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ঃ বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্য
মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্ মহাজনো যেন
গতাঃ স পন্থা॥

বেদসকল ও স্মৃতিসকলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতই দৃষ্ট হয়; যাঁর মতের ভিন্নতা নাই অর্থাৎ যিনি মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে কোন নূতন তত্ত্ব সঞ্চয় না করলেন তিনি মুনিই নন। ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার মধ্যে নিবদ্ধ। এইখানে মস্ত গোল ধর্ম্ম শব্দের অর্থ নিয়ে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি মতবাদকে ও আচরণকে সাধারণতঃ ধর্ম্ম বলা হয়; এখানে ঐ শব্দ ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। এখানে বোধ হয়

"ধারণাৎ ধর্ম্মমিত্যাহ ধর্ম্ম ধারতে প্রজা"—এই অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বিশ্বমঙ্গলকামী মহামানবগণ মানবজীবনের মঙ্গলসাধনের, সাফল্যলাভের জন্য দেশকালপাত্র বিভেদে যে সব বিধিনিষেধ রচনা করেছেন এবং যে সকলের নিষ্ঠাপূর্ণ আচরণে মঙ্গললাভ সম্ভবপর হয়েছে তাকেই ধর্ম্ম বলা হয়েছে। মনে হয় এখানে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তা হলেই "ধর্ম্মস্য তত্ত্ব" মানে গম্যলাভের উপায় কর্ম্মের ঠিক পথ আর মহাজন যে পথ ধরে চলেছেন সেইটাই ঠিক পথ।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত ত ঠিক পথ ধরে চলে এলুম; এখন যত গোল লাগছে ঐ "মহাজন" শব্দটা নিয়ে। বাংলার পল্লী অঞ্চলে "রাজা মহাজন" কথাটার চল আছে; রাজা মানে যাকে খাজনা বা কর দিতে হয় এরূপ জমিদার বা ভূম্যধিকারী; আর মহাজন মানে যে কুসীদজীবী টাকা ও ধান্যাদি কর্জ্জ দেয় এবং পরে সুদসহ আদায় করে। এখানে মহাজন শব্দ যে কুসীদজীবী নয় সে কথাটা মুখ্য মন্ত্রীদের নিরেট মাথায় না ঢুক্‌লেও মুর্খ জনগণের মাথায় সহজেই ঢোকে এবং তারা এক বুক গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে তামা তুলসী হাতে করে বল্‌তে পারে যে মহাজন শব্দটা শাইলকের বা যকের হাল সংস্করণ নয়। কোন কোন পণ্ডিত মহাজন শব্দের অর্থ করেছেন মানবমঙ্গলকামী ঈশ্বর-প্রেরিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কিন্তু তাতেও বড় গোলে পড়তে হয়; ঐরূপ মানবের সংখ্যা এত বেশী যে শেষ পর্য্যন্ত "নানা কথার ছলে,

নানান মুনি বলে, সংশয়ে তাই হুঁশি হে" বল্‌তে বল্‌তে হতাশ হয়ে বসে পড়তে হয়।

কোন কোন পণ্ডিতে মহাজন শব্দের যে অর্থ করেছেন সেইটা গ্রহণ করাই ভাল মনে হয়। তাঁরা বলেন মহাজন মানে বহুজন; অর্থটা গণতন্ত্রসম্মতও বটে। অর্থাৎ বেশী লোকে যা করছে তাই করে চলো, গম্যে পৌছুবে। মানুষ উদ্ভবের প্রথম হতে দেখি পিঁপড়ে কামড়েছে ত মার পিঁপড়ে, মশা কামড়েছে ত লাগাও থাপ্পড়, নারাজের বাড়ি লাগালে লোকহাসিই হবে; সাপ ঘরে ঢুকেছে তাকে মার, আগুনে পোড়াও। ঐ যে টিপেছ ত টিপেছি, মেরেছ ত মেরেছি, যেমন করবে তেমনি পাবে, যেমন দেবে তেমনি দেবো—এই যে মনোভাব যেটাকে দর্পণে মুখদেখা মনোভাব বলা হয়, ঐ মনোভাবই ত শতকরা পঁচানব্বইজন লোক অনুসরণ করে চলেছে। শ্রীকৃষ্ণ ঐ মনোভাবকেই "প্রকৃতি" বলেছেন আর বলেছেন, জীব প্রকৃতির বশেই কাজ করে চলে। যারা প্রকৃতিকে অতিক্রম করে প্রকৃতিবিরুদ্ধ পথে চলে তারা অস্বাভাবিক, unnatural. মহাজন প্রকৃতি অনুসরণ করেই চলে। মহাজন যে পথ ধরে চলেছে সেইটাই ঠিক পথ, যারা নিজের হিত চায় তাদের সবাইকে ঐ পথ ধরে চলতেই হবে; আর ঐ পথে চললেই ঠিক গম্যে পৌঁছবে, সব ঠিক হয়ে যাবে, সব কুয়াসা কেটে যাবে।